পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	তারিখ

সনাতন ধর্ম

দ্বিতীয় খণ্ড

(জাতি-বিভাগ-তত্ত্ব, বিবাহ-সংস্কার,
আশ্রম-প্রকরণ)

স্বামী ভূমানন্দ

[illegible] কার্য্যালয়
কলিকাতা

সনাতন ধর্ম্ম

প্রথম খণ্ড

জাতি-বিভাগ-রহস্য, বিবাহ-পদ্ধতি,
আমিষ-প্রকরণ

স্বামী ভূমানন্দ
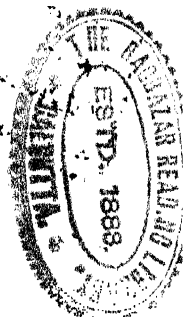
শ্রাবণ, ১৩৩৫

[মূল্য ১৷৷০ আনা

প্রকাশক—

ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ,

উদ্বোধন কার্য্যালয়,

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
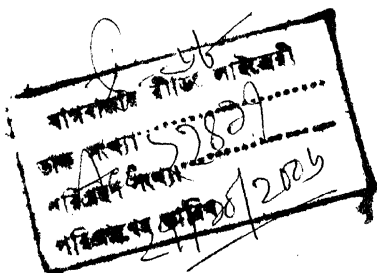
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৪৬।২৮
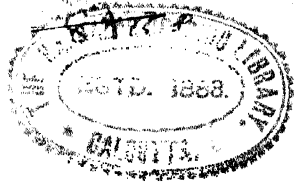
ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"এমন কোন গুণ নাই, যা কোন জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে কোন ব্যক্তিতে যেমন, তেম্‌নি কোন জাতিতে কোন কোন গুণের আধিক্য, প্রাধান্য।

"আমাদের দেশে—মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 'ধর্ম্মের'। আমরা চাই কি—'মুক্তি'। ওরা চায় কি—'ধর্ম্ম'। ধর্ম্ম কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে। ধর্ম্ম কি? যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম্ম হচ্ছে ক্রিয়া-মূলক। ধর্ম্ম মানুষকে দিন রাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

"মোক্ষ কি? যা শেখায় যে ইহলোকের সুখও গোলামী, পরলোকেরও তাই। এ প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এলোকও নয়, পরলোকও নয়। তবে, সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোনার শিকল। তারপর প্রকৃতির মধ্যে বলে বিনাশশীল সে সুখ থাকবে না। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না। * * * এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্ত্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্ম্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষ-মার্গই প্রধান হল। * * * এই যে দেশের দুর্গতির কথা

সকলের মুখে শুনছো, ওটা ঐ ধর্ম্মের অভাব। যদি দেশ-শুদ্ধলোক মোক্ষধর্ম্ম অনুশীলন করে, সে ত ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হ'বে। নইলে খামকা দেশশুদ্ধলোক মিলে সাধু হল, না এদিক্, না ওদিক্। যখন বৌদ্ধ রাজ্যে, এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, কৃশ্চান, মুসলমান, জৈন, ওদের একটা ভ্রম যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল; জাতি প্রকৃতি ভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা, জোর করে এক কর্ত্তে গেলে কি হবে? বৌদ্ধরা বল্লে,—'মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়া-শুদ্ধ মুক্তি নেবে চল'—বলি তা কি হয়? 'তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ও সব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম্ম কর' একথা বলছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। একহাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে। কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে এক বুদ্ধি হয়ে, একটা সাধারণ হিতকর কায কর্ত্তে পার না, মোক্ষ নিতে দৌড়াচ্ছ!! হিন্দু শাস্ত্র বলছেন যে, 'ধর্ম্মের' চেয়ে—'মোক্ষ'টা অবশ্য অনেক বড়,—কিন্তু আগে ধর্ম্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি! অহিংসা ঠিক, 'নির্বৈর' বড় কথা; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনমায়ান্তং' ইত্যাদি। হত্যা করতে

এসেছে এমন ব্রহ্ম-বধেও পাপ নাই মনু বলছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়।

"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ, পরলোকেও তাই। এটিই শাস্ত্র মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য,—স্বধর্ম্ম করহে বাপু! অন্যায় কর না, অত্যাচার কর না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। * * * ঐ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার 'মোক্ষ' !!

"পূর্ব্বে বলেছি যে, ধর্ম্ম হচ্ছে কার্য্য-মূলক। ধার্ম্মিকের লক্ষণ হচ্ছে, সদা কার্য্যশীলতা। এমন কি, অনেক মীমাংসকের মতে বেদে যে স্থলে কার্য্য করতে বলছে না, সে স্থলগুলি বেদই নয়। * * * 'ওঁকারধ্যানে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি,' 'হরিনামে সর্ব্বপাপ নাশ', 'শরণাগতের সর্ব্ব-প্রাপ্ত—এ সমস্ত শাস্ত্র বাক্য, সাধুবাক্য অবশ্য সত্য; কিন্তু দেখতে পাচ্ছ, লাখোলোক ওঁকার জপে মচ্ছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিন রাত প্রভু যা করেন বলছে, পাচ্ছে ঘোড়ার ডিম। তার মানে বুঝতে হবে যে কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ? কে শরণ যথার্থ নিতে পারে? যার কর্ম্ম করে চিত্ত-শুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে 'ধার্ম্মিক'। * * * 'মুক্তি-কামের ভাল' অন্য রূপ, 'ধর্ম্ম-কামের' ভাল আর একপ্রকার। এই গীতা-প্রকাশক

শ্রীভগবান্ এত করে বুঝিয়েছেন, এই মহাসত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ইত্যাদি। 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' '(গীতা ১২।১৩) ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষ-কামের জন্য। আর 'ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ' (গীতা ২।৩) 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব" (গীতা ১১।১৩) ইত্যাদি ধর্ম্মলাভের উপায় ভগবান্ দেখিয়েছেন। * * * ঐ যে মিন্ মিনে পিন্‌পিনে ঢোঁক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা, সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত-চড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, পচা দুর্গন্ধ। অর্জ্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই ত ভগবান্ এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—শেষ 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব'। ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশ শুদ্ধ পড়ে কতই 'হরি' বলছি, ভগবান্‌কে ডাক্‌ছি, ভগবান্ শুনছেনই না,—আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষেই শোনে না, তা ভগবান্। এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগদ্বাক্য শোনা—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ;' 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব।' * * * মোক্ষমার্গ ত প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তারপর বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব ঐখান থেকেই ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী,—'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে, জোর করে দুনিয়া শুদ্ধ লোককে ঐ মোক্ষ-মার্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা কেন? ঘসে-মেজে রূপ, আর ধরে-বেঁধে পিরীত কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়,

তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বল,—কিছুই নয়। হয় তুমি মোক্ষ পাবে, নয় তুমি উৎসন্ন যাও, এই দুই কথা। মোক্ষ ছাড়া যা কিছু চেষ্টা করবে, সে আটঘাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ করবে তার কোনও রাস্তা নাই, বরং প্রতিপদে বাধা। কেবল বৈদিক ধর্ম্মে এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপায় আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্ব্বনাশ, যীশু করলেন গ্রীস রোমের সর্ব্বনাশ !!!

"বৌদ্ধধর্ম্মের আর বৈদিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধ-মতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত, ত আমাদের এ সর্ব্বনাশ কেন হল? 'কালেতে হয়' বল্লে কি চলে? কাল কি কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ছেড়ে কায কর্ত্তে পারে?

"অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও উপায়হীনতায় বৌদ্ধেরা ভারত-বর্ষকে পাতিত করেছে। * * * উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়,—'জাতিধর্ম্ম,' 'স্বধর্ম্ম,' যেটি বেদিক-ধর্ম্মের বৈদিক-সমাজের ভিত্তি। * * * এই 'জাতিধর্ম্ম', 'স্বধর্ম্ম'ই সকল দেশে সামাজিক কল্যাণেয় উপায়, মুক্তির সোপান। ঐ 'জাতিধর্ম্ম' 'স্বধর্ম্ম' নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম-সিধুরাম যা 'জাতিধর্ম্ম' 'স্বধর্ম্ম' বলে বুঝেছেন, ওটা উল্‌টো উৎপাত; নিধু জাতিধর্ম্মের ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন, ওঁর গাঁয়ের আচারকেই সনাতন আচার বলে ধারণা কচ্ছেন, নিজের কোলে ঝোল টানছেন, আর উৎসন্ন যাচ্ছেন।"—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

নিবেদন

যে উপায়হীনতায় বৌদ্ধগণ ভারতকে পাতিত করিয়াছে তাহা দূর করিতে পারে—একমাত্র বেদ। যে বেদ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ সাধনার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতি মানবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাঁহার অনুগামী হইয়া মনু মহারাজ আশ্রম বিভাগ ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া এমন এক মানব-ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন যাহা সম্মুখে রাখিয়া মানুষ স্বধর্ম্ম (one's own natural intuition towards work) বশতঃ কর্ম্ম করিলেই প্রমাণিত হইবে সে কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকারী। এই 'অধিকার বাদ' আর্য্যজাতির নিজস্ব সম্পত্তি যাহা জগতে অন্য কোন জাতির নাই।

গুণগত জাতি প্রকৃতির বিধানে সৃষ্ট; অতএব ইহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বংশগত জাতি ভগবানের অভিসম্পাত,—মানবের অসম্ভব কল্পনা—যাহা পালন করিতে গেলে বা করিলে—বলক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। প্রথম অবশ্যম্ভাবী সনাতন সত্যকে অস্বীকার করিয়া এবং পরবর্ত্তী অবশ্যম্ভাবী বিনাশশীল পন্থাকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ এমন এক 'কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়' অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন যাহা ভীষণ সামাজিক বিপ্লব ভিন্ন কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতেই পারে না ও পারিতেছে না।

অতএব হিন্দুজাতির কল্যাণের জন্য ভীষণ সামাজিক বিপ্লব আবশ্যক হইয়াছে যাহার ফলে হিন্দুকে বাধ্য হইয়া হয় বেদ নতুবা মৃত্যু—এতদুভয়ের একটিকে আশ্রয় করিতেই হইবে।

বর্ত্তমান জগতে 'জাতীয় ধারা' বজায় রাখিবার এক প্রবল ঢেউ উঠিয়াছে। সেই ঢেউ অস্মদ্দেশে ও হিন্দুর জাতীয় জীবন-দ্বারে আসিয়া সশব্দে আঘাত করতঃ হিন্দুকে সচেতন করিতেছে। সুতরাং এক্ষণে জগতে এমন কোন জাতি নাই যাহার সঙ্গে অঙ্গ মিলিত করিয়া—আপন ধর্ম্ম বা জাতীয় ধারা ত্যাগপূর্ব্বক—হিন্দু গৌরব অনুভব করিতে পারিবেন।

স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ মাত্র উন্মেষের ফলে বহুশতাব্দীর অত্যাচার ও উৎপীড়ন-জর্জ্জরিত ভারতের তথাকথিত অন্ত্যজ জাতির মধ্যে যে আশা আকাঙ্ক্ষা তীব্র আবেগে জাগিয়া উঠিতেছে —তাহাকে পথ প্রদর্শন ও গতি প্রদান করিতে—বেদ ও বেদানুগামী মনুসংহিতাই একমাত্র সক্ষম।

তাই আমরা 'সনাতন ধর্ম্ম' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। এই পুস্তক তিনটি প্রবন্ধে বিভক্ত—(১) জাতি-বিভাগ রহস্য, (২) বিবাহ-পদ্ধতি, (৩) আমিষ প্রকরণ, এই 'জাতি-বিভাগ' রহস্যে দেখান হইয়াছে—এক জাতি ভিন্ন অন্য জাতি নাই—সেই জাতিই ব্রাহ্মণ। 'বিবাহ পদ্ধতিতে' দেখান হইয়াছে—কোন পথে কেমন গতিলাভ করিয়া হিন্দু সমাজকে কেমন এক 'ছন্নছাড়া' অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'আমিষ-প্রকরণে' দেখান হইয়াছে—হিন্দু সমাজ কোন্ মাংস খাইতে পারেন—কোন মাংস তাঁহার পক্ষে—অখাদ্য।

এই পুস্তকের বিষয়ীভূত সমস্ত প্রবন্ধগুলিই বিশেষভাবে বেদানুগামী-মনুমহারাজের মতের উপর দৃষ্টি রাখিয়া রচিত। হিন্দু সমাজ ইহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উপকার বোধ করিলে—শ্রম সফল মনে করিব।

'উদ্বোধন'
জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৫ সাল।

অলমিতি—
শ্রীভূমানন্দ

শান্তিপাঠ—ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

অর্থাৎ—উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণের উদ্ভব হয়, পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

প্রথম অধ্যায়

সুপ্ত হিন্দুশক্তির জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। এই নব জাগরণের উন্মেষে সমাজের সকল স্তরেই যেন সাড়া পড়িয়াছে।

হিন্দুর জাগরণ।

সকলেই আপন আপন বর্ণের সমাজ-সংস্কারে ব্যস্ত। কিন্তু কেহই এক বর্ণের সহিত অপর বর্ণের কোন যোগসূত্র ছিল কিনা তাহা জানিতে চাহে না। ইহা দেখিয়া স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা হয়,—"ফল খেয়ে ঘুরে মরে গাছ চেনে না।"

আজ কেহই অস্বীকার করিবে না যে, জাগ্রত হিন্দুশক্তি নিজের ঘর গুছাইতে মন দিয়াছে। কিন্তু কোন "বর্ণই" বর্ত্তমান

অতীতের প্রতি দৃষ্টি আবশ্যক।

ছাড়িয়া সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টি দিতে রাজি নহে, যেন তাহাদের অতীত-গৌরব করিবার কিছুই ছিল না বা নাই। ইহা অতীব দুঃখের বিষয়।

Prof. Max Müller writes,—"If then, with all the documents before us, we ask the question—does caste, as we find in Manu at the present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided—"No." There is no authority whatever in the hymns of the Veda for complicated system of castes, no authority for the offensive privileges claimed by the Brahmins, no authority for the degraded position of the Sudras. There is no law to prohibit the different classes of the people living together from eating and drinking together, no law to prohibit the marriage of people belonging to different caste, no law to brand the offerings of such marriages with an indelible stigma."

এই উক্তির ভাবার্থ,—বৈদিক সমস্ত গ্রন্থ যাহা আমাদের নিকট আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি জানিতে চাই মনুসংহিতায় এবং বর্ত্তমান হিন্দু-ভারতে যে রকম (বংশগত) জাতিবিভাগ বিদ্যমান উহা প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদ-সম্মত কি না? নিঃসঙ্কোচে উত্তর হইবে—"না"। বৈদিকমন্ত্রে জটিল জাতিবিভাগ, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিশেষ সুবিধা, শূদ্রের নিম্নতম পদপ্রাপ্তি ইত্যাদির কোন বিধান দৃষ্ট হইবে না। বেদ-সম্মত এমন কোন বিধান নাই যাহাতে বিভিন্ন "শ্রেণীর" এক সঙ্গে বসবাস, এক সঙ্গে পানাহার, বিভিন্ন "শ্রেণীর" মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইতে

পারে অথবা এমন কোন বধান নাই যাহাতে ঐ রকম বিবাহের সন্তানদিগের "অন্ত্যজ" (চণ্ডাল, নিষাদ, পুক্কস) অর্থাৎ "জন্মের দোষ" এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

উক্ত বেদমতের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজ।

এই স্বদেশী বিদেশী বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের মন্তব্যের উত্তরে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজ ঊর্দ্ধে "মনুর বচন" পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলেন, "মনু-সংহিতায় যখন বংশগত জাতিবিভাগ রহিয়াছে তখন নিশ্চিতই উহা বেদ-সম্মত। আর তাও যদি না থাকে, ক্ষতি কি? যতদিন হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণসমাজের কথা মান্য করিয়া চলিবে ততদিন আমরা সমাজকে যে ভাবে পাইয়াছি তাহার উপরই ব্যবস্থা দিয়া যাইব।" কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইঁহারা কখন ভাবিতে শিখেন নাই যে, বেদ ও বেদানুগামী মনুর মত ছাড়িয়া কখন হিন্দুধর্ম্মের কোন ব্যবস্থা দেওয়া চলে না।

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, বেদের নাম শুনিলেই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজ চঞ্চল হইয়া উঠেন কিন্তু স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসের কথায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাইয়া থাকেন। এই জন্য আমাদের আলোচ্য বিষয় "জাতি-বিভাগ-রহস্য" সংহিতা ও মহাভারত সহায়ে আলোচনা করিব। পাঠকগণ! দেখিবেন আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই গুণগত বর্ণ বংশগত বর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও—এক অখণ্ড ব্রাহ্মণ জাতি ছাড়া এ ভারতে সংহিতার যুগে আর কোন জাতি ছিল না। বেদে যে অনার্য্য জাতির উল্লেখ আছে সংহিতাযুগের পূর্ব্বেই সেই অনার্য্য জাতিও বেদ-পন্থীদের কুক্ষিগত হইয়াছিল। নতুবা অনার্য্যগণ গেল কোথায়?

ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মধ্যে বেদানুগামী ও বৌদ্ধযুগের পর হইতে বেদ-বিরোধী এই উভয় মত একই গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে। এমন কোন ইতিহাস, পুরাণ নাই যাহার মধ্যে এ দোষ দৃষ্ট হইবে না। বেদ ও মনু-সংহিতায়ও এ দোষ দৃষ্ট হইবে। তাই বর্ত্তমান আকার-প্রাপ্ত মনুসংহিতায় দেখা যায় যে, একা মনুই বক্তা নহেন। সুতরাং যে মনু গুণগত জাতি স্বীকার করিয়া অনু ও প্রতিলোম প্রথায় বিবাহ দ্বারা এক জাতীয়ত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন—সেই মনু-সংহিতায় "বীজ-প্রধান" করিয়াও যে অন্ত্যজ জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল (বিবাহ প্রকরণ দেখুন) তাহার জন্য মনু দায়ী নহেন। যে মনু বলিয়াছেন, —(১) "দ্বিজাতির পরিচর্য্যাই শূদ্রের একমাত্র কর্ত্তব্য"—যাহার ভাষ্যে মেধাতিথি বলেন,—(২) "শূদ্রের জন্য বিশেষ কোন বিধি বলা হয় নাই এই নিমিত্ত দানাদি শূদ্রের নিষিদ্ধ নহে এবং শূদ্রদের এই সকল কর্ম্মে যে বিধি আছে তাহা হইতে ভবিষ্যতে দেখাইব যে শূদ্রের যজ্ঞেও অধিকার আছে," সেই সংহিতা মান্য করিয়া কিম্বা যে ভৃগু, গৌতম প্রভৃতির ব্যবস্থা যাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনকে দ্বিজাতি স্বীকার করিয়াও ধীরে অতি সন্তর্পণে ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে ছোট করিয়া শেষে একেবারে পৃথকবর্ণে দাঁড় করাইয়া-

ধর্ম্ম শাস্ত্রাদিতে বেদানুগামী ও বেদবিরুদ্ধ উভয় মতই বর্ত্তমান। কেন—তৎ প্রতীকার। দায়ী কে ?

---

(১) "একমেব তু শূদ্রস্য"। মনু, ১ অধ্যায়, ৯১ শ্লোক।

(২) "এতদ্দৃষ্টার্থং শূদ্রস্য অবিধায়কত্বাচ্চৈকমেবেতি ন দানাদয়ো নিষিধ্যন্তে। বিধিরেষাং কর্ম্মনামুত্তরত্র ভবিষ্যতি অতঃ স্বরূপবিভাগেন যাগাদীনাং তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ।"—মেধাতিথি।

ছিল, যাঁহাদের ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের উপনয়ন হইতে অশৌচ পর্য্যন্ত পৃথক ব্যবস্থা হইয়াছিল, যাঁহাদের ব্যবস্থায় অনুলোম, প্রতিলোম সহ স্বয়ম্বর প্রথা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সহ নিয়োগ প্রথা বন্ধ করিবার জন্য নির্লজ্জের ন্যায় মনুর বিধানের অগ্রে ও পশ্চাতে বিরুদ্ধ-শ্লোকের সমাবেশ হইয়াছিল এবং "দায়ভাগে" অতি বড় অবিচার করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র পুত্রকে পৈত্রিক সম্পত্তি যৎসামান্য দেওয়া হইয়াছিল—ইহাদের মধ্যে মনু বা ভৃগু কাহার ব্যবস্থা মান্য করিয়া চলিলে হিন্দু জাতির কল্যাণ হইবে তাহা তাঁহাদেরই বিচার্য্য বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু জানি—"মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতিরপধান্যতে"—অর্থাৎ যাহা বেদানুগামী মনুর বিধানের বিরোধী তাহা (সেরূপ ব্যবস্থা) ত্যাগ করিবে।

মনুর বিরোধী বিধান ত্যাজ্য।

তবুও অনেকে হয় ত আশঙ্কা করিতে পারেন যে—জাতিবিভাগ লোপ হইলে দেশে যজন, যাজন, দেব, পিতৃকার্য্যও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কাজ হয় ত কেহ শ্রদ্ধার সঙ্গে করিতে চাহিবে না। তখন এ জাতির কল্যাণ কি করিয়া সমুৎপাদিত হইবে?

আশঙ্কা।

এ আশঙ্কা শ্রীভগবানই দূর করিয়া রাখিয়াছেন। গীতায় আছে—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"—(১)

অর্থাৎ 'স্বকীয় কঠিন ধর্ম্ম পরকীয় সহজ ধর্ম্ম অপেক্ষা

আশঙ্কা-নিরসন।

(১) গীতা, ৩য় অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক।

হিতকর। স্বকীয় ধর্ম্মে মরণও কল্যাণজনক, কিন্তু পরকীয় ধর্ম্ম ভয়াবহ।' পাঠক! এই "স্বধর্ম্ম" লইয়া ভারতে অনেক বিচার হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে আমরা দুই মতের উল্লেখ করিব, আপনারা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন—কোন্ মত গ্রহণ-যোগ্য আর কোন্ মতই বা পরিত্যাজ্য। যাঁহারা বংশগত জাতিবিভাগ স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, শূদ্রের কার্য্য সহজ হইলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কখন শূদ্রের কাজ করিবে না। তেমন ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণাদির কাজ সহজসাধ্য হইলেও তাহা করিবে না। এজন্য যদি মৃত্যু হয় সেও শ্রেয়ঃ—তবুও ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। কিন্তু যাঁহারা বংশগত জাতি স্বীকার না করিয়া গুণগত জাতিই প্রকৃত জাতি স্বীকার করেন তাঁহারা "স্বধর্ম্ম" শব্দের অর্থ ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের কর্ম্মে অনুরাগ (one's own natural intuition towards work) বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, ব্রাহ্মণের ঘরের কোন ছেলে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন না করিয়া বলচর্চ্চা, বাণিজ্য কিম্বা সেবা করিতে চায় উহা তাহার "স্বধর্ম্ম", তাহা তাহাকে করিতে দিলেই সে স্বধর্ম্ম বলিয়া উৎসাহের সহিত উহা করিতে থাকিবে। এখানে সেই ব্রাহ্মণের ছেলেকে যদি বাধ্য করিয়া যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন করিতে বলা হয়—সে প্রমাদ গণিবে। সুতরাং জানিতে হইবে উহা তাহার "স্বধর্ম্ম" নহে।

"স্বধর্ম্ম" শব্দের তাৎপর্য্য।

বর্ত্তমান ভারতে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য হিন্দুজাতি যে ভাবে

বংশগত বর্ণ-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কর্ম্মাশ্রয় করিয়াছে—তাহা দেখি-য়াও কি কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন "স্বধর্ম্ম" অর্থাৎ বর্ণগত কর্ম্ম—যাহা মনু-সংহিতায় দৃষ্ট হইবে—তাহা তাহারা করিতেছে ? উত্তর হইবে 'না।' ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়—কেন বর্ণগত ধর্ম্ম করিতে পারিতেছে না ? তাহার উত্তর—ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিলেই বৃত্তিতে সে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তাই আমরা ব্রাহ্মণকে হাইকোর্টের জজ হইতে আরম্ভ করিয়া পিয়ন, পাচক ও মুটে পর্য্যন্ত সমস্ত কাজেই দেখিতেছি এবং ইহা হইতে সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছি যে, তাহারা যে যাহা করিতেছে উহাই তাহাদের "স্বধর্ম্ম"। সুতরাং গুণগত বর্ণ যেমন চিরদিন ছিল তেমনই থাকা বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমান কালে বর্ণগত কর্ম্ম-বিভ্রাট।

বংশগত বর্ণ—বেদ ও মনুর বিরুদ্ধে ভৃগুর অসম্ভব কল্পনা। এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে যাইয়াই হিন্দু জাতির বর্ত্তমান দুরবস্থা। হিন্দুগণ ! অবহিত হউন।

অসম্ভব বংশগত বর্ণকে সম্ভব-করণ-প্রয়াসে হিন্দুর দুরবস্থা।

সংহিতায়—অধ্যয়ন সমর্থদিগকে দ্বি-জাতি বলা হইয়াছে। দ্বিজাতির লক্ষণ গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত গৃহোক্ত কর্ম্ম স্বয়ং মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সম্পাদন করা। শূদ্র বিদ্যাহীন, সুতরাং মন্ত্র দ্বারা গৃহোক্ত কর্ম্ম স্বয়ং সম্পাদন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না বলিয়াই, ক্রিয়া কর্ম্মেও সে বঞ্চিত থাকিত। সুতরাং এ যুগে যাঁহারা লেখাপড়া জানেন—তাঁহারাই নিজগৃহে গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিলে দেব ও পিতৃকার্য্য লোপ পাইবে

সংহিতার যুগে দ্বিজাতি ও শূদ্র। প্রতীকার।

প্রতীকার।

না—অন্যথায় লোপ পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। কেন, সে কথা পরে বলিব।

মূল মনুসংহিতা বড় গ্রন্থ নহে।

মূল মনুসংহিতাখানা খুব বড় গ্রন্থ নহে—তাহা বর্ত্তমান আকার-প্রাপ্ত মনু-সংহিতাখানাই যে কেহ ভাল-রূপে পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন; এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন মুনিগণের, মহর্ষিগণের এবং ভৃগুর অভিমতের সহিত যাগযজ্ঞের, বিধবা-বিবাহের, অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের, নিয়োগ-প্রথার বিরুদ্ধে এবং মূর্খ হইলেও ব্রাহ্মণ জগৎ-পূজ্য ইত্যাদির স্বপক্ষে যে বেদ-বিরোধী শ্লোকগুলি আছে তাহা বাদ দিলে সংহিতাখানা খুব বড় গ্রন্থ হইবে না।

বৈদিক মতে "অন্ত্যজ" আখ্যা অস্বীকার্য্য।

বৈদিকযুগে—কর্ম্মসহায়ে "শ্রেণি"-বিভাগ ছিল, সংহিতায়ও তাহাই আছে। সুতরাং এই "শ্রেণি"-বিভাগ থাকা স্বত্ত্বেও অনুলোম (বিবাহ) প্রথাতে কেহ বর্ণহীন এবং প্রতিলোম-প্রথার বিবাহের ফলে "অন্ত্যজ" আখ্যা পাইতে পারেন একথা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না। যখন এক অখণ্ড আর্য্য তথা ব্রাহ্মণ জাতিই—সকল বর্ণ, বর্ণহীন এবং অন্ত্যজ জাতিতে বিভক্ত ও পরিণত হইয়াছে—তখন, "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে—

"অগ্নি র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥—(১)

অর্থাৎ—যেমন এক অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া (বস্তু আশ্রয়ে) বিভিন্নরূপ ধারণ করে, তেমনই সকল ভূতের অন্তর্বর্ত্তী একই আত্মা রূপে রূপে প্রবেশ করিয়া তদনুরূপ ধারণ করে।

একই আর্য্য বা ব্রাহ্মণ বিভিন্ন বর্ণে বিদ্যমান।

জাতি-বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে, এক অফুরন্ত কামনা জীবকে আশ্রয় করিয়া যেমন বিভিন্ন উপায়ে কামনা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করে, তেমনই এক আর্য্যজাতি বা ব্রাহ্মণই বিভিন্ন রকম কর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন বর্ণে বিদ্যমান আছে। ইহা আমাদের অনুমান মাত্র নহে, ইহাই শাস্ত্র-সম্মত কথা।

উপরে যাহা শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া উক্ত হইল তাহা দর্শাইবার

---

(১) কঠ—২ অধ্যায়; ২ বল্লী; ৯ মন্ত্র।

পূর্ব্বে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের সংহিতাদি শাস্ত্রগুলি বেদবিরুদ্ধ নানাবিধ বাক্য ও প্রহেলিকার জাল সৃষ্টি-পূর্ব্বক বেদবাদী হিন্দু জাতিকে অবৈদিক পথে লইয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল জাল হইতে আমাদিগকে অতি সাবধানে সত্য বাছিয়া লইতে হইবে, খোসা ভুষি বাদ দিয়া—বেদানুগামী মত গ্রহণ ও তদ্বিরোধী মত পরিত্যাগ করিতে হইবে; এবং এতৎ প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্র সহায়ে আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।

সংহিতাদি শাস্ত্রের বেদ-বিরোধী বাক-প্রহেলিকাজাল হইতে বেদ-সম্মত সত্যকে বাছিতে হইবে।

এখন সংহিতাদি দেখা যাক্। বর্ত্তমান আকার-প্রাপ্ত মনু-সংহিতা বলেন, "মহাতেজস্বী সেই স্বয়ম্ভু সমস্ত সৃষ্টি-পরিচালনের জন্য মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্র কল্পনা করিলেন।—(১)।

বর্ত্তমান আকার-প্রাপ্ত মনুসংহিতা।

কিন্তু গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"সমোঽহং সর্ব্ব-ভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ"।—(২) অর্থাৎ আমি সকল ভূতের নিকট সমান—কেহ আমার অপ্রিয় নহে, কেহ প্রিয় নহে।

গীতা।

ভগবান্ জগৎসৃষ্টি করেন নাই। সৃষ্টি অনাদি—শ্রীভগবান্ তাহার অভিব্যক্তি-কর্ত্তামাত্র। ভগবান্ জগৎসৃষ্টি করিলে তাহাতে

(১) মনু—১ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক।

(২) গীতা—৯ অধ্যায়; ২৯ শ্লোক।

বৈষম্য ও নৈঘৃণ্য এই দুই দোষ অবশ্য স্পর্শ করিত। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ও তৎভাষ্যকারগণ কেহই ভগবানে বৈষম্য ও নৈঘৃণ্য দোষ স্বীকার করেন না। এই মূল তথ্যটি বুঝিতে না পারিলে আমরা শাস্ত্রার্থ ভাল বুঝিতে পারিব না। অতএব আমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে।

সৃষ্টি-তত্ত্ব

আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া দার্শনিক ও পৌরাণিক মত সকল একই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দেখিয়াছি। কেন এমন হইল—ভাবিতে গিয়া সহজ বুদ্ধিতে ইহাই প্রতীত হইল যে, পরবর্ত্তী যুগে কোন এক সময় সকল শাস্ত্রই, প্রচলিত মত এক সঙ্গে, বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। যে দিনে ভারতের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাওয়া বিশেষ দুরূহ ছিল—সেই যুগে শাস্ত্রের মধ্যে এমন শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিতে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল,—ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রাধান্য রক্ষার জন্য,—এ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল,—বৈদিক যাগযজ্ঞকে অচল করিবার জন্য। এই দুই উৎপাত ভারতের ভাগ্যে উপস্থিত না হইলে—একই শাস্ত্র গ্রন্থে—এত অধিক পরস্পর-বিরোধী মতের সমাবেশ কখন দৃষ্ট হইত না। সুতরাং আমরাও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে শাস্ত্রে যেমন দেখিয়াছি তাহার উল্লেখ করিতেছি। আপনারা অবহিত হউন।

(১) ঋগ্বেদ

এই ঋগ্বেদের সময়ে ভারতে মাত্র দুইটি জাতির পরিচয় পাওয়া যায় ঃ—(ক) আর্য্য, (খ) অনার্য্য।

ঋগ্বেদের প্রথম হইতে নবম মণ্ডল পর্য্যন্ত ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে,—উশিজঃ, ব্রাহ্মণ, বিপ্র, ক্ষত্রিয়া এই কয়টি বৈদিক শব্দ কোথায় কি অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়াছে তাহা দেখিতে পাইব।

ঋগ্বেদ—১ম মণ্ডল, ৬০সূক্ত, ২ঋক,—মূলে 'উশিজঃ' শব্দ রহিয়াছে। ইহার অর্থ কাময়মানা দেবাঃ অথবা উশিজঃ—'মেধাবিনঃ স্তোতারঃ।'—সায়ন।

" " ৮৬ " ২ঋক,—মূলে 'বিপ্রস্থ বা' আছে, অর্থ 'আযজমানস্থ মেধাবিনঃ।'

" ৬ষ্ঠ " ৭৫ " ১০ " মূলে 'ব্রাহ্মণাসঃ' রহিয়াছে, অর্থ স্তোত্রকারগণ।

" " " " ১৯ " মূলে 'ব্রহ্ম' আছে, অর্থ মন্ত্র।

" ৭ম " ১০৪ " ৮ " মূলে 'ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত ব্রাহ্মণাম' আছে,—অর্থ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পাঠকারী স্তোতাগণ।

" ৮ম " ১১ " ৬ " মূলে 'বিপ্রং দেবং অগ্নিং' আছে,—ঐ 'বিপ্র' অর্থ মেধাবী। অর্থাৎ মেধাবী দেব অগ্নি। অগ্নি কখন বিপ্রবর্ণ ছিলেন এ কথা ঋকের উদ্দেশ্য নহে, তাহা কেহ বলেনও না। সুতরাং

দেখা যাইতেছে প্রথম মণ্ডল হইতে নবম মণ্ডল পর্য্যন্ত যেখানে উশিজঃ, ব্রাহ্মণ, বিপ্র শব্দ মূলে রহিয়াছে সেখানে যথাক্রমে অর্থ হইয়াছে,—মেধাবী—স্তোতা, স্তোতা, মেধাবী।

ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল ৬৪ সূক্ত ২ ঋক মূলে 'ক্ষত্রিয়া যাতমর্বাক। ইলাং নো মিত্র বরুণোত' আছে,—অর্থ বলশালী মিত্র ও বরুণ। মিত্র ও বরুণ কখন ক্ষত্রিয় বর্ণ ছিলেন এ কথা মন্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। নবম মণ্ডল পর্য্যন্ত —বৈশ্য বা শূদ্র শব্দের কোন উল্লেখ দেখা গেল না।

কিন্তু দশম মণ্ডল—৯০ সূক্ত (যাহাকে চলিত কথায় পুরুষ সূক্ত বলা হয়) ১১ ও ১২ ঋকে * আছে,—"পুরুষকে খণ্ডখণ্ড করা হইল, কয়খণ্ড করা হইয়াছিল ? ইহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত, দুই উরু, দুই

* যৎ পুরুষং ব্যদধুঃকতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ১১ ঋক ॥

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃপদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২ ঋক ॥

চরণ কি হইল? এই প্রশ্নের উত্তর পরের ঋকে বলা হইয়াছে; যথা,—ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা উরু ছিল তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ শূদ্র হইল। এই রকম অন্য ঋক ঋগ্বেদে নাই। সুতরাং দশম মণ্ডলে যে ভাবে গুণানুসারে কর্ম্ম বিভাগ হইয়াছে তাহা কদাচ দোষাবহ হইতে পারে না। তবে যদি কেহ বলিতে চান সৃষ্টি এই ভাবে হইয়াছিল—তাহা অদার্শনিক এবং অবৈজ্ঞানিক কথা হইবে। যে বেদ হইতে ধর্ম্মের প্রকাশ হয়, যাহা সনাতন, তাহাতে অদার্শনিক ও অবৈজ্ঞানিক কথা স্থান পাইলে—বেদ যে অভ্রান্ত সে কথার কোন অর্থই রহিবে না। গুণের দ্বারা কর্ম্মের বিভাগ ইহাই যদি ১১।১২ ঋকের প্রতিপাদ্য হয়, তবে অন্যান্য ঋক মন্ত্রের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করা চলিবে। কিন্তু কেহ যদি বলিতে চান ইহাই (১১।১২ ঋক) বংশগত বর্ণের পরিচয়, আমরা সে কথা স্বীকার করিব না।

কিন্তু এই পুরুষ সূক্তকে দুই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রক্ষিপ্ত বলিতে চান ঃ—(ক) ব্যাকরণবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন, অন্যান্য ঋকের ভাষা এবং পুরুষ-সূক্তের ভাষা এক নহে। ঋগ্বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই বৈদিক বা "দেব ভাষা"তে লিখিত পুরুষ-সূক্ত সহ অপর কতকগুলি ঋক অনেক পরবর্ত্তী যুগে "সংস্কৃত" ভাষাতে লিখিত; (খ) ঋগ্বেদের অন্য কোথায়ও বংশগত বর্ণবিভাগ দৃষ্ট হইবে না। সুতরাং যখন গুণগত বর্ণ, বংশগত বর্ণে পরিণত হইয়াছিল তখনই উহা ঋগ্বেদে পুরুষ-সূক্ত নামে স্থান লাভ করিল। কারণ সে দিন বেদে যাহা ছিল না তাহা কেহ প্রচলন করিতে পারিত না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্ত মতামত অগ্রাহ্য করিয়াও যদি স্বীকার করি পুরুষ-সূক্ত প্রক্ষিপ্ত নহে তাহা হইলেও আমরা কখন ঋগ্বেদ হইতে বংশগত জাতি-বিভাগ প্রমাণ করিতে পরিব না। বরং যাঁহারা গুণগত বর্ণের সমর্থনকারী তাঁহারা একাধিক প্রমাণ পাইবেন যে গুণগত বর্ণই বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। আর্য্যজাতি নিজ গুণানুসারেই কর্ম্ম করিত। উদাহরণ স্বরূপ ৯ম মণ্ডল, ১১২ সূক্তে দুইটি ঋকমন্ত্র উদ্ধৃত করা গেল :—(১) হে সোম! সকল ব্যক্তির কার্য্য এক প্রকার নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, আমাদিগের কার্য্য ও নানাবিধ, দেখ তক্ষ (ছুতার) কাট তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞ-কর্ত্তাকে চাহে। অতএব তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ১ম ঋক॥ এই ঋকমন্ত্র পড়িয়া যদি কেহ বলেন, ইহাতে গুণগত কর্ম্ম বুঝাইলেও সেই গুণগত কর্ম্ম যে বংশগত ছিল না তাহার প্রমাণ কোথায়? ইহার উত্তরে আমরা দ্বিতীয় ঋক মন্ত্রটি উদ্ধার করিয়া দেখাইব,—একই বংশে বিভিন্ন কর্ম্ম কেমন সুন্দর ভাবে তখন প্রচলিত ছিল, যথা :—

(২) দেখ, আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা যব-ভর্জ্জণ-কারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি যে রূপ গাভী সকল গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরাও ধন-কামনায় তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥ ৩য় ঋক॥

সুতরাং ঋগ্বেদ হইতে পরিষ্কার দেখা গেল—যাহার যেমন গুণ সে তেমন কর্ম্ম করিত—স্তোত্রকার-পুত্র বৈদ্য (চিকিৎসা

ব্যবসায়ী) হইতেন—কন্যা যব-ভর্জনকারিণী হইলে আশ্চর্য্য হইবার বা জাতি যাইবার কিছু ছিল না। অথবা পৃথক বর্ণের মধ্যে পড়িয়া খাওয়া দাওয়াও বন্ধ থাকিত না। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বা গুণগত বর্ণ। ঋগ্বেদে সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণনায় দার্শনিক মত দৃষ্ট হইল না। যে মত দৃষ্ট হইল তাহাও সম্পূর্ণ অভিনব—দর্শন-শাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র বা প্রাণি-তত্ত্ববিদ্যা (Biology) কোন মতবাদই উহা সমর্থন করিবে না। কিন্তু বেদ যখন অভ্রান্ত তখন মানিতেই হইবে 'পুরুষ সূক্তকে' কোন বিশেষ মত স্থাপনের জন্য পরবর্ত্তী যুগে বিধিবদ্ধ করতঃ বেদমধ্যে প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। এমন অদার্শনিক, অবৈজ্ঞানিক সৃষ্টি-প্রকরণ কেমন করিয়া ঋগ্বেদে স্থান পাইল—ভাবিতে গেলে 'মতলব হাসিল' করিবার প্রচেষ্টা ছাড়া অপর কোন কথা মনে আসিবে না। যে বেদ হইতে ধর্ম্মের প্রকাশ হয়—সেই বেদে অদার্শনিক পুরুষ-সূক্ত যদি বংশগত বর্ণের প্রতিষ্ঠার কারণ হয় তাহা হইলে বেদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য উহা ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগ করিবার অন্য হেতুও আছে,—পাঠক ! তাহা মনুসংহিতা ও অপর পুরাণাদির আলোচনায় পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন।

(২) মনু সংহিতা

সৃষ্টিকার্য্যে ক্ষমতাশালী অহঙ্কার-তত্ত্ব ও পঞ্চ-তন্মাত্রা এই ছয় পদার্থের সূক্ষ্ম অবয়ব স্বমাত্রাতে অর্থাৎ তন্মাত্রার বিকার পঞ্চমহাভূতে ও অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয়ে উপযুক্তভাবে যোজনা

করিয়া মনুষ্য, পশু, পক্ষী এবং স্থাবর প্রভৃতি ভূত সকলের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১।১৬ ॥ ইহা হইল প্রথম মতবাদ। দ্বিতীয় মতবাদ এই ঃ—সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি আপন দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একভাগে পুরুষ অপর ভাগে নারী হইয়া সেই নারীতে বিরাট নামক পুরুষের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১।৩২ ॥ সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃজন করিয়াছিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমাকেই সেই সৃষ্ট-সন্তান, সৃষ্টির কারণ মনু বলিয়া জ্ঞাত হও ॥ ১।৩৩ ॥ মনুসংহিতায় মনু প্রথম সৃষ্ট মনুষ্য, মুখজাত ব্রাহ্মণ নহেন। তার পর মনু বলিতেছেন, আমি প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে কঠোর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করিয়াছি ॥ ১।৩৪ ॥ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ—এই দশজন প্রজাপতি ॥ ১।৩৫ ॥ * * * ইহারা কিন্নর, বানর, বহুবিধ পক্ষী, মৎস্য, পশু, মনুষ্য ও সর্প ও উভয় পাটি দন্তবিশিষ্ট জন্তু সৃষ্টি করিলেন ॥ ১।৩৯ ॥ ইহার পার্শ্বে নিম্নের শ্লোকটি রক্ষা করিয়া বলুন—এই তিন মতের মধ্যে কোন মত সত্য? মনুসংহিতায় একই অধ্যায়ে এই মত দৃষ্ট হইবে। যথা ঃ—আদিপুরুষ ব্রহ্মা ভূলোকে প্রজাবৃদ্ধির অভিলাষে আপন মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্র, এই বর্ণ চতুষ্টয় উৎপন্ন করিলেন ॥ ১।৩১ ॥ পাঠক! দেখিতে পাইবেন প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে যাহা একবার বলা হইয়াছে তাহাই আবার প্রথম অধ্যায়ের ৮৭।৯৪ শ্লোকে পুনরুক্তি করা হইয়াছে। যাহাতে আমরা অধিক জোর দিতে পারি, বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই একই কথা একই অধ্যায়ে

দুইবার বলা হইয়াছে। এই কথা দশম অধ্যায়ের ৪ শ্লোকেও আবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

যে দেশ ষড় দর্শনের জন্মভূমি—সেই দেশে প্রথম মতবাদ ছাড়িয়া এমন অদার্শনিক সৃষ্টি-তত্ত্ব ভারতের গৌরব বৃদ্ধি ও সনাতন ধর্ম্ম ঠিক প্রচার করিতেছে কি না তাহা সকলের পক্ষে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। ক্ষমতা হাতে পাইয়া ক্ষত্রিয়কে শূদ্র পদবীতে দাঁড় করাইলেই ক্ষত্রিয় শূদ্র হয় না কিম্বা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ বলিলেই ব্রহ্মার মুখজাত হয় না,—এই কথাগুলি আমাদিগকে নূতন করিয়া শিখিতে হইবে। সনাতন অর্থ নিত্য। সুতরাং সনাতন ধর্ম্মীকেও জানিতে হইবে,—যাহা নিত্য, সত্য তাহা ত্যাগ করিয়া অনিত্য, অসত্য আশ্রয় করিয়া সনাতন ধর্ম্মী হওয়া এবং প্রকৃত সনাতনধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কখন ধর্ম্মাচরণ ও করা যায় না। অতএব আমরা মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায় সৃষ্টি-তত্ত্ব প্রকরণে মাত্র একটি মত গ্রহণ করিয়া বাকী সকল শ্লোক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। মনুসংহিতায় সৃষ্টি-তত্ত্বে আমরা দার্শনিক মতই গ্রহণ করিলাম। যে কোন দার্শনিক মত সৃষ্টি-তত্ত্বের জন্য গ্রহণ করিলে 'মুখজাত ব্রাহ্মণের' পরিচয় কোথায় ও মিলিবে না, মিলিতে পারেও না। বরং মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও বিষ্ণু পুরাণে 'মুখজাত বলিয়া যাহার নাম করা হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হইলে অনেকেই পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই।

(৩) বিষ্ণু সংহিতা

ব্রহ্ম-রজনী অবসানে ভগবান্ পদ্মযোনি জাগরিত হইলে
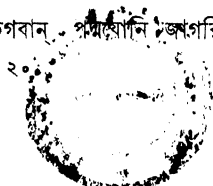
বিষ্ণু সর্ব্বভূত সৃজন করিতে অভিলাষী হইলেন। * * * এইরূপে পৃথিবীপ্লাবী জলরাশিকে, নিজ নিজ স্থানে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সপ্ত পাতাল * * * লোকপাল, নদী, পর্ব্বত, বনস্পতি, ধর্ম্মবেত্তা সপ্তর্ষি, সাঙ্গ-বেদ, সুরাসুর, পিশাচ, সর্প, যক্ষ, রাক্ষস, **মানুষ,** পশু, পক্ষী, মৃগাদি, নানাবিধ প্রাণী * * * সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথম অধ্যায়॥

এখানে ধর্ম্মবেত্তা সপ্তর্ষি ও মানুষের কথাই সর্ব্বপ্রথমে রহিয়াছে তাহার পর চারিবর্ণের কথা—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা—অনেক কথাই যুক্ত হইয়াছে।—বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেকার সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের শ্লোকের সমাবেশ যেমন রহিয়াছে, বিষ্ণু-সংহিতায়ও তাহা আছে। এই সকল বিরুদ্ধ ভাবের সহিত ভারত ভারতী অনেক শতাব্দী যাবৎ পরিচত আছেন। তাহারই জন্য আমরা দার্শনিক দিকটা যেখানে যেমন পাইব তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব,—আদিতে গুণগত বর্ণই ছিল, পরে উহাকে বংশগত বর্ণে পরিণত করিয়া মহা অনর্থ করা হইয়াছে।

(৪) মহাভারত

আদিপর্ব্ব—অনুক্রমনিকাধ্যায়ে লিখিত আছে,—"প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্যনীয়, অনির্ব্বচনীয়, সত্য-স্বরূপ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ

করিলেন। তৎপরে স্থাণু, স্বায়ম্ভুব মনু, দশ প্রচেতা, দক্ষ, দক্ষের সপ্তপুত্র, সপ্তর্ষি, চতুর্দ্দশ মনু জন্মলাভ করেন। মহর্ষিগণ এক-তান মনে যাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, সাধুগণ, পিশাচ গুহ্যক এবং পিতৃগণ উৎপন্ন করিলেন। অনন্তর অনেকানেক বিদ্বান্ মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন।" কিন্তু গ্রন্থারম্ভে সৃষ্টির তালিকায় এত উৎপন্নের মধ্যে ব্রহ্মার মুখজাত ব্রাহ্মণ, বাহুজাত ক্ষত্রিয়, ঊরুজাত বৈশ্য এবং পাদজাত শূদ্রের কোন উল্লেখই দেখা গেল না। কিন্তু মহাভারতে এমন অনেক শ্লোক আছে—যাহা বংশগত বর্ণ সমর্থন করে নাই,—যথা :—

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—

* * * যদি শূদ্রযোনি-সম্ভূত ব্যক্তিও সদ্‌গুণ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে, এবং সেই আর্জ্জব-সম্পন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে॥ বনপর্ব্ব, দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়॥ ব্রাহ্মণ কহিলেন,—* * * যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি, কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়॥ বনপর্ব্ব, চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়॥ কপিল কহিলেন,— * * * অন্যের ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যখন কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নিরূপিত হইতেছে, তখন কর্ম্মকেই পুরুষের মঙ্গল ও অমঙ্গলের জ্ঞাপক বলিতে হইবে॥ শান্তিপর্ব্ব, সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যয়॥ ভীষ্ম কহিলেন,— * * * যদি কোন ব্যক্তি

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে তাহাকে শূদ্র ও যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ হন, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ॥ শান্তিপর্ব্ব, অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায় ॥ ভীষ্ম কহিলেন,— * * * সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ হইতে সম্ভূত হইয়াছে। অতএব সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং সকল বর্ণেরই বেদপাঠ করিবার অধিকার আছে ॥ শান্তিপর্ব্ব, একোন-বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায় ॥

হনুমান কহিলেন,— * * * যোগীদিগের পরব্রহ্মই পরম গতি। নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মা, তৎকালে স্বতঃসিদ্ধ শমদম প্রভৃতি গুণসম্পন্ন স্বকর্ম্মরত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারাই প্রজা ছিলেন। সমান কর্ম্ম বিশিষ্ট এই চতুর্বর্ণই ব্রহ্মাশ্রয়ী, ব্রহ্মগতি ও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন এবং একমাত্র ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেন। তাঁহারা এক পরমাত্মা এক প্রণব মন্ত্র, এক বেদান্ত শ্রবণাদিরূপ বিধি ও এক ধ্যানাদি স্বরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পৃথক ধর্ম্ম-সম্পন্ন হইলেও একবেদ ও এক প্রকার কর্ম্মে নিয়ত ব্রতী ছিলেন এবং আশ্রম চতুষ্টয় সমুচিত দর্শাদি কর্ম্ম দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হইতেন ॥ বনপর্ব্ব,, অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ॥

ভীষ্ম কহিলেন,— * * * "ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের উদ্ভব হইয়াছে, এই নিমিত্ত ঐ তিনবর্ণের স্বভাবতঃ সমুদয় যজ্ঞে অধিকার আছে। আর যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়

ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন ঐ তিনবর্ণ ব্রাহ্মণের জ্ঞাতি-স্বরূপ ॥" শান্তিপর্ব্ব—ষষ্ঠিতম অধ্যায় ॥

মনু সূত্রাকারে যাহা সংহিতায় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই মহাভারত (ইতিহাস) বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে সকলেই দেখিলেন,—(ক) সকলবর্ণের বেদপাঠ করিবার অধিকার আছে। (খ) সকলবর্ণের যজ্ঞাদি করিবার অধিকারও রহিয়াছে, (গ) চারিবর্ণ পরস্পরের জ্ঞাতি।

আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে বর্ণচতুষ্টয়ের পরস্পরের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহাও দেখাইয়াছি। কিন্তু মহাভারত সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় অন্যত্র দেখা গেল,—মনু ব্রহ্মার পুত্র (১) নহেন। ব্রহ্মার মানস পুত্রের তালিকায় ছয়জন দৃষ্ট হইবে, যথা ঃ—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরঃ, পৌলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ (২) হইতেই দেব ও মানবের বংশের উদ্ভব হইয়াছে।

(৫) মার্কণ্ডেয় পুরাণ

জৈমিনি প্রশ্ন করিলেন,—"কি প্রকারে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি হইল? * * * কি প্রকারে দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ এবং ভূতাদির উৎপত্তি হয় * * ? ইত্যাদি। উত্তরে সৃষ্টির দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইবার পরে মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "এই নানা বীর্য্যবান্ সাতটি পদার্থ

---

(১) মহাভারত. আদিপর্ব্ব, পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

(২) " " ষট্‌ষষ্টিম ..।

যৎকালে পৃথকভাবে থাকে তৎকালে প্রজাসৃজনে সমর্থ হয় না। ইহারা যৎকালে পরস্পর মিলিয়া পরস্পরকে অবলম্বন পূর্ব্বক সম্যক্ প্রকারে একতা প্রাপ্ত হয় এবং যৎকালে পুরুষের অধিষ্ঠান ও প্রকৃতির অনুগ্রহ লাভ করে তৎকালে মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত ঐ সকলে অণ্ড সমুৎপাদন করে। ঐ অণ্ড জলবিম্বের ন্যায় জলে আশ্রয়পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মহামতে! সলিলস্থ ঐ অণ্ড ভূতগণ হইতে বৃহৎ। ব্রহ্মাবিধেয় ক্ষেত্রজ্ঞ ও সেই প্রাকৃত অণ্ডে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। তিনিই প্রথম শরীরী এবং পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। তিনিই ভূতসমূহের আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা। তিনিই এই সকলের অগ্রে বিরাজিত হইয়া থাকেন। * * * সুরাসুর মানুষপূর্ণ অখিল জগৎ সেই অণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। * * * এই প্রকৃতিই ক্ষেত্র ও ব্রহ্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত। * * * এই প্রকারেই ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রাকৃত সৃষ্টি অবুদ্ধি সহকারে প্রথমে বিদ্যুল্লতার ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছে॥" পঞ্চ চত্বারিংশ অধ্যায়—৫৯—৭৩ শ্লোক॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—* * * "দেবযোনি অষ্টবিধ সৃষ্টি করিয়া স্বদেহ হইতে অন্য পশুপক্ষী সকল উৎপন্ন করিলেন। মুখ হইতে ছাগ, বক্ষ হইতে পক্ষী, উদর ও পার্শ্বদেশ হইতে গো * * * প্রাদুর্ভূত হইয়াছে * * * অতঃপর স্থাবর জঙ্গম ভূতগণ, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ কিন্নর ইত্যাদি যাবতীয় শরীরী ও অশরীরী পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে॥" অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ২৫ হইতে ৩০ শ্লোক॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,— * * * "পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, * * মানুষ, পশু, পক্ষী, ইত্যাদি সরীসৃপ, * * * অণ্ডজ প্রাণিগণ

অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে॥" উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়—১৬ শ্লোক॥

অনন্তর প্রভু ব্রহ্মা সেই পূর্ব্বসৃষ্ট আত্মসদৃশ পুরুষকে স্বায়ম্ভুব মনু নাম দিয়া প্রজাপালক করিলেন। আর তপস্যা দ্বারা বিধূতপাপা সেই কামিনীকে শতরূপা নাম প্রদান করিলেন। সেই পুরুষ (মনু) হইতে শতরূপার দুইটি পুত্র হইল,—নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তান-পাদ; ইঁহারা উভয়েই স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা প্রসিদ্ধ॥ পঞ্চাশৎ অধ্যায়-১০—১৫ শ্লোক।

এ পর্য্যন্ত আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণে ব্রহ্মার মুখজাত ব্রাহ্মণের কোন পরিচয় পাইলাম না। 'বরং মুখজাত' বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে—তাহাকে 'ছাগ' বলা হইয়াছে।

(৬) বিষ্ণু পুরাণ

(ক) দ্বিতীয় অধ্যায়। হে মৈত্রেয়! সনাতন বিষ্ণু এই প্রকাণ্ড জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কর্ত্তা। তিনিই সর্ব্বভূতে আত্মরূপে বিরাজমান আছেন। তিনি পরমাত্মা স্বরূপ। তিনি অজ, অক্ষয়, অব্যয়, নিত্য পরমব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্ব্বে অতীত প্রলয় কালে দিবস বা রাত্রি, আকাশ বা ভূমি, কিম্বা অন্য কোন পদার্থই ছিল না। তৎকালে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি ও পুরুষ ও ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। নিরুপাধি বিষ্ণুর প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায় কাল নামে আর একটি রূপ আছে। প্রকৃতি ও পুরুষ ঐ কালের সহিত সৃষ্টিকালে যোজিত ও প্রলয়কালে বিয়োজিত হন। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় প্রবাহের আদি বা অন্ত নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন মহাপ্রলয়

কালে প্রকৃতি ও পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করেন। অনন্তর সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে পরমব্রহ্ম স্বীয় ইচ্ছানুসারে জগতের উপাদান-কারণ-স্বরূপ প্রকৃতিতে ও নিমিত্ত-কারণ-স্বরূপ পুরুষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৃষ্টিকে উন্মুখ করিয়াছেন। প্রথমে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকার মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে যথাক্রমে বৈকারিক তৈজস ও ভূতাদি এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের উৎপন্ন হইল। ভূতাদি বা তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ, শব্দ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রূপ, রূপ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে রস, রস হইতে জল, জল হইতে গন্ধ এবং গন্ধ হইতে পদার্থ সৃষ্ট হইল।

(খ) চতুর্থ অধ্যায়,—প্রলয়কালে নীর অর্থাৎ জল বিষ্ণুর অয়ন অর্থাৎ বাসস্থান হয়, এই জন্য বিষ্ণুর নাম নারায়ণ। এই বারাহ কল্পে ভগবান্ বরাহ রূপ অবলম্বন করিয়া জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। পঞ্চম অধ্যায়,—ব্রহ্মা হইতে প্রথমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র উৎপন্ন হইল। পরে তিনি বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্গণের এবং পশু-পক্ষ্যাদি তির্য্যগ্ জাতির সৃষ্টি করিয়া, সত্ত্বগুণপ্রধান ঊর্দ্ধস্রোত দেবগণকে সৃজন করিলেন। তৎপরে তিনি অর্ব্বাক স্রোত মনুষ্যগণের সৃষ্টি করেন। মনুষ্যেরা রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য-নিবন্ধন সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত ও সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা কুমারগণের (সনকাদির) সৃষ্টি করিলেন।

পরে ব্রহ্মার দেহ হইতে অসুরগণের উৎপত্তি হয়। তৎপরে তিনি ঘোরদর্শন শ্মশ্রুধারী ক্ষুধাতুর প্রাণিগণের সৃষ্টি

করিলেন। তাহারা স্বষ্ট হইবামাত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া ব্রহ্মাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইল। তাহাদের মধ্যে যাহারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইল, তাহারা রক্ষ, এবং যাহারা ভক্ষণ করিতে স্বীকৃত হইল, তাহারা যক্ষ নামে অভিহিত হইল। উহাদিগের বিকটাকার অবলোকনে তিনি অত্যন্ত ক্রোধাসক্ত হওয়াতে তাহার কেশপাশ বিশীর্ণ ও ভূতলে নিপতিত হইয়া সর্পরূপে পরিণত হইল। ব্রহ্মার মস্তক হইতে কেশ সর্পিত অর্থাৎ বিগলিত হওয়াতে সর্প, এবং তাহা একেবারে মস্তক হইতে হীন হইল না বলিয়া, অহিনামে অভিহিত হইয়াছে। তিনি কোপযুক্ত ক্রোধন-স্বভাব ঘোরদর্শন কপিল-বর্ণ মাংসাশী পিশাচগণের স্বষ্টি করিয়া গন্ধর্ব্বগণের স্বষ্টি করেন। গো অর্থাৎ গীত (বাক্যামৃত) ধয়ন অর্থাৎ পান করিতে করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহারা গন্ধর্ব্ব নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মার বক্ষঃস্থল হইতে মেষ, মুখ হইতে ছাগ, উদর ও পার্শ্ব হইতে গো, পদদ্বয় হইতে অশ্ব * * *কৃষ্ণসার প্রভৃতি পশুজাতি এবং রোম হইতে ফল, মূল ও ওষধি সমূহ সমুৎপন্ন হইল।

(গ) ষষ্ঠ অধ্যায়,—ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরু দেশ হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। এই চারি বর্ণই যজ্ঞাধিকারী। যজ্ঞ সম্পাদনার্থই ইঁহারা স্বষ্ট হইয়াছেন।

যে কেহ এই ভাবে বেদ, সংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল পড়িবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন,—ভারতীয় দর্শন-বিজ্ঞানকে বলি দিয়া ব্রহ্মার 'মুখজাত' ব্রাহ্মণ দাঁড় করাইয়া

বংশগত বর্ণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থ সকল ব্রাহ্মণ বর্ণের হস্তে ছিল বলিয়াই এই বিষময় ফল ফলিয়াছে। যে দেশে ষড় দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল—সে দেশে এমন অদার্শনিক কথা কখন প্রচার হইতে পারিত না, যদি ধর্ম্মগ্রন্থসকল ব্রাহ্মণের 'একচাটিয়া' নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হইবার সুবিধা না পাইত। আমরা যাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিলাম বংশগত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রাচীন মত নহে। উহাকে প্রাচীন মতে পরিণত করিবার জন্যই পুরুষ সূক্তকে ঋগ্বেদ ভুক্ত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতিতেও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। নতুবা আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় বেদান্ত ও সাংখ্য মত সকল ধর্ম্মগ্রন্থের অগ্রভাগে দেখিতে পাইতাম না। দেখিতে পাইতাম সেই 'মুখজাত' ব্রাহ্মণেরই কথা।

মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে পরিষ্কার ভাষাতে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে। মহাভারতে শূদ্রের বেদপাঠ করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণকে পরস্পরের জ্ঞাতি বলা হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যে বর্ণ বিভাগ ঘটিয়াছিল উহাকে বংশগত বর্ণে পরিণত করিয়া, ব্রাহ্মণ নিজ বংশের দুলাল-গণের প্রতি অত্যধিক প্রীতি দেখাইতে যাইয়া, যে স্থায়ীবর্ণবিভাগ ঘটাইয়াছিলেন তাহার জন্য ব্রাহ্মণগণ এবং বিশেষভাবে ভৃগুবংশ বা গোত্রই দায়ী। এই ভৃগুবংশ ব্রাহ্মণ বর্ণের বংশগত প্রাধান্য রক্ষার জন্য যে সকল অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন তাহার আলোচনা পাঠক, পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥"

সুতরাং সৃষ্টি-তত্ত্বের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দিকটা ছাড়িয়া দিয়াও আমরা যদি পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া লই তাহা হইলেও এক পুরুষ হইতে যে চতুর্ব্বর্ণের কল্পনা তাহাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কি রকম সম্পর্ক থাকা উচিত তাহা পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যে সংহিতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা জাতিবিভাগের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ধার করিতে ব্রতী হইয়াছি, সেই মনু সংহিতায় একমাত্র "মনু"ই বক্তা নহেন। "মহর্ষিগণ বলিতেছেন", "অগস্ত্য করিয়াছেন" "মুনিগণের অভিমত" "ভৃগু বলেন" ইহা ছাড়াও অনেক ঋষির নাম আছে যাহা বাহুল্যভয়ে আর উল্লেখ করিলাম না। 'মন্বর্থ-বিপরীত' মতাদি এইরূপ মুনি ঋষি প্রভৃতির বচন মধ্যেই বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হইবে। সংহিতায় এমন বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শ্লোকের একত্র সমাবেশ দেখিয়া বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে ও আপাত দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হইবে।

সাধারণের স্বভাব প্রায় একই রকম। কি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে তাহারা তাহা কখন বুঝিতে

চেষ্টা করিবে না। তাহারা প্রতি শ্লোকেরই অর্থ বুঝিতে চায়। আমাদের মনে হয়, যাঁহারা সংহিতার আদর্শ কি জানেন না, ক্রমাগত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শ্লোকের সমাবেশ দেখিয়া তাঁহাদিগকে বিচলিত হইতে হইবে। এক্ষেত্রে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, প্রথম বা মূল সংহিতাকার মনু কাহাকেও বিচলিত হইবার অবকাশ দেন নাই। মনু বলেন,—ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুব্যক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ—বেদ ১। প্রশ্ন উঠিতে পারে শ্রুতি ও স্মৃতিতে মতানৈক্য ঘটিলে কি হইবে? মনু এ সমস্যারও মীমাংসা করিয়াছেন, যথা,—"যে স্থলে বেদ ও স্মৃতির অনৈক্য সেখানে বেদমতই গ্রাহ্য হইবে।" "যে স্থলে শ্রুতির মতই দুই প্রকার সেখানে উভয় মতকেই সম্যকধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ২। সুতরাং শ্রুতি সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান নাই, তাঁহারা কি করিয়া বুঝিবেন—সংহিতা বা সংহিতার অংশবিশেষ বেদানুগামী কি না? বর্ত্তমান ভারতে ধর্ম্মসমস্যার কোনই মীমাংসা যে হয় না তাহার একমাত্র কারণ বেদের বিধানের সহিত অপর ধর্ম্মগ্রন্থের কোথায় মতানৈক্য তাহা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া আলোচনা দ্বারা মীমাংসা করেন না বলিয়া। যেদিন এ রকম আলোচনা আরম্ভ হইবে আমাদের মনে হয় সেই দিন হইতে ব্রাহ্ম ও আর্য্য-সমাজীরা হিন্দুসমাজের কেহ নহেন একথা কেহ বলিবেন না। তখন সকলেই দেখিতে পাইবেন—জ্ঞানকাণ্ড সহায়ে ব্রাহ্ম, কর্ম্মকাণ্ড সহায়ে আর্য্য সমাজ যতটা বেদাদর্শে চালিত, বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ তাহার তুলনায় অনেক পশ্চাতে। বেদ না মানিয়া, বেদ বিরোধী মত

আশ্রয় করিয়া হিন্দু-সমাজ হইল "সনাতনী" আর বেদ মানিয়া ব্রাহ্ম ও আর্য্য-সমাজী হইল—বেদদ্রোহী! প্রকৃতির পরিহাস আর কাহাকে বলে?

প্রসঙ্গক্রমে হিন্দুসমাজের জ্ঞাতকারণ আমরা সংক্ষেপে বেদের কয়েকটি মোট তত্ত্ব আলোচনা করিব।

বেদ কর্ম্ম ও জ্ঞান।

বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—(১) কর্ম্মকাণ্ড, (২) জ্ঞানকাণ্ড। এই বেদ—চতুর্ব্বর্গফল দাতা।

চতুর্ব্বর্গ অর্থ।

চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্ম সহায়ে লভ্য। মোক্ষলাভ জ্ঞান-সাপেক্ষ।

চতুর্ব্বর্গের অধিকারী।

এই কর্ম্ম ও জ্ঞানসহায়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ করিবার অধিকার—সকলেরই আছে। সিদ্ধি—প্রবর্ত্তক-সাধকের কর্ম্ম-কুশলতার উপরে নির্ভর করে। কর্ম্ম-কাণ্ড যাগ-যজ্ঞাদি আশ্রয়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-কামীর অভিষ্ট পূর্ণ করে, জ্ঞান অনাসক্ত ব্যক্তির মোক্ষ বিধান করে।

কর্ম্মকাণ্ড।

কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত যজ্ঞ—প্রধানতঃ তিন রকম ছিল,—অশ্বমেধ, গোমেধ, অজমেধ। সুতরাং বৈদিক ঋষিগণ খাদ্যবিষয়ে খুব উদার ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যজ্ঞও হয় না, খাদ্যও ভীষণ ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

---

(১) "ধর্ম্মজিজ্ঞাসুমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥"—মনু, ২য় অধ্যায়, ১৩ শ্লোক।

(২) মনু. ২য় অধ্যায়, ১৪ শ্লোক।

আমরা বলিতে আসিয়াছি জাতিবিভাগের কথা। সুতরাং এখন দেখা যাউক মনুসংহিতার কোথায়ও এমন স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় কিনা যাহাতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর তিন বর্ণের কোন বর্ণকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। পাঠক দেখিবেন মনু বলিতেছেন—

ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর তিন বর্ণ কি—ব্রাহ্মণ ?

ব্রাহ্মণের পীড়নকারী ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণই (অভিশাপাদির দ্বারা) শাসন-কর্ত্তা। যেহেতু (ব্রহ্মার বাহু হইতে উৎপন্ন) ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন বলা যায়। (১)

চিরপ্রভা এই শ্লোকের টীকায় যাহা লিখিয়াছেন(২)—তাহা কুল্লুক ভট্টের টীকার প্রায় অনুরূপ—তজ্জন্য পৃথক্ অনুবাদ আর দিলাম না।

টীকাকার কুল্লুকভট্ট বলেন,—(৩)—ব্রাহ্মণের প্রতি সর্ব্বদা

---

(১) মনু—৯ অধ্যায়, ৩২০ শ্লোক। আমরা যে সংহিতা হইতে এই বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম উহা ৺কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের দ্বারা লিখিত। সুতরাং বলিতে হইবে এই অনুবাদে ভ্রম-প্রমাদ না থাকাই সম্ভব।

(২) ক্ষত্রস্যেতি. ব্রাহ্মণান্ প্রতি সর্ব্বপ্রকারেণ প্রবৃদ্ধস্য পীড়য়িতুং প্রবৃত্তস্য ক্ষত্রিয়স্য ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ এব শাপাদিনা নিয়ন্তা শাসিতা স্যাৎ ব্রহ্মণো বাহুপ্রভবত্বাত্তস্য। হি শব্দোহেতৌ ক্ষত্রিয়স্যানন্তরোৎপন্নতয়া তদুদ্ভবে ব্রাহ্মণস্য হেতুত্বং ভঙ্গ্যাপ্রতিপাদিতং সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদব্রহ্মেতি শ্রুতিরপি তথা বোধয়তি ॥৩২০॥—চিরপ্রভা।

(৩) ক্ষত্রস্যেতি। ক্ষত্রিয়স্য ব্রাহ্মণান্ প্রতি সর্ব্বথা পীড়ানুবৃত্তস্য ব্রহ্মণা এব শাপাভিচারাদিনা সম্যক্নিয়ন্তারঃ যস্মাৎ ক্ষত্রিয়ে ব্রাহ্মণাৎ সম্ভূতঃ ব্রহ্মণে বাহুপ্রসূতত্বাৎ ॥৩২০॥—কুল্লুকভট্ট।

পীড়নকারী ক্ষত্রিয়দিগকে শাপাভিচারাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার ব্রাহ্মণের আছে যেহেতু ব্রহ্মার বাহু হইতে ক্ষত্রিয় সম্ভূত হইয়াছে।

ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেন, (১)—ক্ষাত্রিয় ব্রহ্ম হইতে জাত। ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ হইতেই ক্ষত্রিয়জাতি সম্ভব হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এইযে,—যে যাহার উৎপত্তি-হেতু সে তাহার নাশক হইতে পারে না।

মনুর উক্ত শ্লোক ও তাহার টীকা ও ভাষ্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ সমাজের উত্তর কি?

আজ যদি বৈশ্য শূদ্র এবং অন্ত্যজ জাতি মেধাতিথির ভাষ্য এবং চিরপ্রভা ও কুল্লুকভট্টের টীকাসহ মূলশ্লোকটি—"ক্ষত্রস্যাতিপ্রবৃদ্ধস্য ব্রাহ্মণান্ প্রতি সর্ব্বশঃ ব্রহ্মৈব সন্নিয়ন্তৃ স্যাৎ ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্" (৯ অধ্যায়, ৩২০) লইয়া ব্রাহ্মণ সভার দ্বারদেশে যাইয়া মিনতি জানাইয়া বলে— "প্রভু আমরাও সেই বিরাটপুরুষের অঙ্গ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আপনাদের স্বজাতি জ্ঞাতি, (১০ম অধ্যায় ৪ শ্লোক) আমাদিগকে অযথা তাড়না করিয়া কেন পশু পদবীতে দাঁড় করাইয়াছেন? আমাদিগকে 'দূর, দূর' না করিয়া যাহাতে আমরাও সংস্কার গ্রহণ করিয়া উন্নত হইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করুন"—ইহার উত্তরে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজ কি বলিবেন তাহাই আজ হিন্দু-ভারত জানিতে চাহে।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন—"ব্রহ্ম-সম্ভবম্" দেখিয়াই লেখকের

---

(১) * * * অত্র হেতুঃ ক্ষত্রং ব্রহ্মসম্ভবং ব্রাহ্মণজাতেঃ সকাশাৎ ক্ষত্রিয়াণাং সম্ভবঃ। অত্রার্থবাদ এবায়ম্। ননু যো যস্যোৎপত্তিহেতুর্ণাসো তস্য নাশকঃ ॥৩২০॥—মেধাতিথি।

এত উল্লাস করা ভাল হয় নাই। উত্তরে আমরা বলিব—বেশ কথা,—কিন্তু ঠিক পরের শ্লোকে যে আরও পরিষ্কারভাবে লিখিত হইয়াছে তাহাও কি উপেক্ষার বিষয় হইবে; যথা,—"জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, পাষাণ হইতে লৌহাস্ত্র উৎপন্ন হয়। ইহাদের তেজ সর্ব্বত্র দহনাদি কার্য্যে সক্ষম হইলেও আপন আপন উৎপত্তি স্থলে কার্য্যকরী হয় না অর্থাৎ অগ্নি জলকে দগ্ধ করিতে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিতে, অস্ত্র পাষাণকে ছেদন করিতে সক্ষম হয় না॥ মনু, ৯ অধ্যায়, ৩২১ শ্লোক॥

ইহা হইতে পরিষ্কার উক্তি মনুসংহিতায় নাই। না থাকিবার হেতু—তখন সকলেই জানিত—এক আর্য্য বা ব্রাহ্মণ জাতিই গুণ ও কর্ম্মাশ্রয়ে—বিভিন্ন বর্ণ হইয়াছেন।

সংহিতা শাস্ত্রগ্রন্থ—ইতিহাস নহে। তাই আমরা মহাভারতে এ সম্বন্ধে যেমন বিস্তৃতভাবে আলোচনা দেখিতে পাইব, অন্য কোন সংহিতায় তত বিশদভাবে দেখিতে পাইব না।

সংহিতাও মহাভারত। সকল বর্ণের বেদপাঠে অধিকার মহাভারতে স্বীকৃত।

মহাভারতে ভীষ্ম বলিতেছেন, (১)—সকল বর্ণই ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছে। অতএব সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং <u>সকল বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার আছে</u>।

মহাভারতে শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার আছে—দেখিয়া হিন্দু মনে নূতন আলোক প্রদান করিবে। বৈদিক যুগে গুণগত শূদ্র

(১) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব একোনবিংশত্যধিকত্রিশত-তম অধ্যায়।

শ্রদ্ধা ও বিদ্যাহীন বলিয়া বেদপাঠে অক্ষম ছিল—অনধিকারী ছিল না। শ্রুতির কোন্ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া কেহ দেখাইতে পারিবেন না শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার নাই। পরবর্ত্তী যুগে যখন বংশগত জাতির সৃষ্টি হইল—তখন বিদ্যাহীন গুণগত শূদ্রের পক্ষে যাহা অসম্ভব ছিল—বংশগত শূদ্রের পক্ষে তাহাই বহাল রাখিতে ভৃগু—মনুসংহিতায়, পরাশর—পরাশর-সংহিতায় উৎসাহী হইলেন। কিন্তু বেদ-বিভাগকারী ব্যাসদেব—অবৈদিক ব্যবস্থা দিতে পারিলেন না তাই মহাভারতে ইহার উল্লেখ পরিষ্কার রহিয়াছে। শূদ্রগণ! অবহিত হউন।

মহাভারতে নূতন আলোক।

শূদ্রগণ অবহিত হউন।

অতঃপর আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব মনুসংহিতা ভিন্ন অন্য কোন সংহিতায় চতুর্ব্বর্ণ যে একই জাতি এমন কোন কথার পরিষ্কার উল্লেখ আছে কি না।

সকলেই জ্ঞাত আছেন যে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত—"বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে এক সঙ্গে পুস্তকাকারে উনবিংশতি সংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে প্রথম সংহিতকার মহর্ষি অত্রি বলেন, (১)—

অত্রি সংহিতা।

(১) দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রোনিষাদকঃ।
পশু ম্লেচ্ছোঽপিচাণ্ডালো বিপ্র দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৬৪ শ্লোক॥
সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতা-নিত্য-পূজনম্।
অতিথিং বৈশ্যদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ৩৬৫ শ্লোক॥
শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।

"দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, (শ্লোকে রাজা শব্দ দ্রষ্টব্য) বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডাল এই দশবিধ (দশবিধলক্ষণাক্রান্ত এই শব্দ অনুবাদে ব্র্যাকেটে উক্ত পুস্তকে আছে, কিন্তু মূল শ্লোকে "লক্ষণাক্রান্ত" কথার উল্লেখ নাই) ব্রাহ্মণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ॥ ৩৬২ ॥ যিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথি-সেবা এবং বৈশ্যদেব করেন, তাঁহাকে "দেব" ব্রাহ্মণ কহে ॥ ৩৬৫ ॥ শাকপত্রফল-মূল-ভোজী বনবাসী এবং নিত্য শ্রাদ্ধ-

---

নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্র মুনিরুচ্যতে ॥৩৬৬ ॥
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রোদ্বিজ উচ্যতে ॥ ৩৬৭ ॥
অস্ত্রহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসংমুখে ।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে ॥ ৩৬৮ ॥
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে ॥ ৩৬৯ ॥
লাক্ষালবণ-সংমিশ্রকুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাম্ ।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে ॥ ৩৭০ ॥
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা ।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥ ৩৭১ ॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥ ৩৭২ ॥
বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রোম্লেচ্ছ উচ্যতে ॥ ৩৭৩ ॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে ॥" ৩৭৪ ॥

রত ব্রাহ্মণ "মুনি" বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন ॥ ৩৬৬ ॥ যিনি, প্রত্যহ বেদান্ত-পাঠী, সর্ব্বসঙ্গত্যাগী, সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্য জ্ঞানে তৎপর, সেই ব্রাহ্মণ "দ্বিজ" নামে অভিহিত হন ॥ ৩৬৭ ॥ যিনি সমরস্থলে সর্ব্বসমক্ষে আরম্ভ-সময়েই ধন্বীদিগকে অস্ত্রদ্বারা আহত ও পরাজিত করেন, সেই ব্রাহ্মণের "ক্ষত্র" সংজ্ঞা ॥ ৩৬৮ ॥ কৃষিকার্য্য-রত গো-প্রতিপালক এবং বাণিজ্য-তৎপর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বলিয়া উক্ত হন ॥ ৩৬৯ ॥ যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ "শূদ্র" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ॥ ৩৭০ ॥

চৌর, তস্কর (বলপূর্ব্বক ধনাপহারী), সূচক (কুপরামর্শ দাতা), দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্য-মাংসলোভী ব্রাহ্মণ "নিষাদ" বলিয়া কথিত ॥ ৩৭১ ॥ যে, ব্রহ্ম-তত্ত্ব কিছুই জানে না অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলেই অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ "পশু" বলিয়া খ্যাত ॥ ৩৭২ ॥ যে নিঃশঙ্কভাবে কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম রুদ্ধ করে সেই ব্রাহ্মণ "ম্লেচ্ছ" বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৭৩ ॥ ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম-রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ "চণ্ডাল" বলিয়া গণ্য ॥ ৩৭৪ ॥

মনুর সূত্র, অত্রির ভাষ্য।

মনু মহারাজ মনু-সংহিতায় যাহা দুইটি মাত্র শ্লোকে সূত্রাকারে বলিয়াছেন তাহাই যেন মহর্ষি অত্রি,—অত্রিসংহিতায়—ভাষ্যাকারে বলিয়া গেলেন। রক্ষণশীল সমাজ ইহার প্রতিবাদে কি বলিতে চাহেন? শুধু কি মনু ও অত্রিই—ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের

একজাতীয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে। ভগবান্ ব্যাসদেবও মহাভারতে ঠিক এই ভাবের অনেক কথাই বলিয়াছেন যথা,—(১) বর্ণের কোন বিশেষত্ব নাই; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। ব্রহ্মা পূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কর্ম্মের দ্বারা বর্ণপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল রক্তবর্ণ দ্বিজ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কামভোগপ্রিয়, কর্কশস্বভাব, ক্রোধী ও সাহসী হইলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়পদবাচ্য হইলেন। যে সমুদয় পীতবর্ণ দ্বিজ স্বীয় ধর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিয়া গো-কৃষি হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বৈশ্য হইলেন। যে সকল কৃষ্ণবর্ণ দ্বিজ শৌচভ্রষ্ট, হিংসাপরায়ণ, মিথ্যাবাদী ও লোভী এবং যাঁহারা সকল কর্ম্মের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা শূদ্রতা প্রাপ্ত হইলেন। এই চারিটি বর্ণ; পূর্ব্বে ব্রহ্মা ইঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার দিয়াছিলেন; কিন্তু লোভ বশতঃ ইঁহারা অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইলেন।

মহাভারত।

গুণগত বর্ণের স্বরূপ।

---

(১) ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বংব্রহ্মইদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কাম-ভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসাঽনৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ-পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতে চতুরোবর্ণাঃ যেষাং ব্রাহ্মী স্বরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাদজ্ঞানতাং গতাঃ॥

গুণগত বর্ণই যে সনাতন ধর্ম্ম তাহা নিম্নের শ্লোক (১) হইতে বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না, যথা ;—যিনি জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের দ্বারা শুচি, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, ষট্‌কর্ম্মে অবস্থিত, সম্যক্ শৌচাচার-সম্পন্ন,—গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী ও সত্যবাদী, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হন।

গুণগত বর্ণের পরিচয়।

যাঁহার মধ্যে সত্য, দান, অদ্রোহ, আনৃশংস, লজ্জা, ঘৃণা ও তপস্যা দেখা যায়, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। যিনি বেদাধ্যয়নযুক্ত হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম করেন, আদান-প্রদানে যাঁহার আনন্দ হয়, তিনি 'ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত হন। যিনি বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, কৃষিবাণিজ্য ও পশুরক্ষা যাঁহার বৃত্তি, তিনি 'বৈশ্য' নামে অভিহিত হন। যিনি বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, অনাচারী

---

(১) জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন-সম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ ॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যক্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংসং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চদৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥
ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়ন-সঙ্গতঃ।
দানাদান রতির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥
বাণিজ্যপশুরক্ষা চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন-সম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ।
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

হইয়া সমস্ত ভোজ্যই ভক্ষণ করিয়া থাকেন, সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনিই 'শূদ্র' নামে অভিহিত হন।

ইহা হইতেও পরিষ্কার ভাষাতে মহাভারত, শান্তিপর্ব্বে (১), দেখিতে পাইব, ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—"সমুদয় যজ্ঞের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা মহৎ দেবতা-স্বরূপ। উহা যাজ্ঞিকদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পরস্পর পরস্পরের পরম দেবতা-স্বরূপ। তাঁহারা বিবিধ মনোরথ সফল করিবার মানসে নানা প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও হিতকর উপদেশ সকলকে প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা দেবগণেরও দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

মহাভারত—শান্তি পর্ব্ব।

ব্রাহ্মণ হইতে (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) বর্ণত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য ঐ তিন বর্ণের স্বভাবতঃই সমুদয় যজ্ঞে অধিকার আছে। ঋক, যজুঃ, সাম, বেদ-বেত্তা-ব্রাহ্মণ দেবতার ন্যায় সকলেরই পূজ্য। আর যে ব্রাহ্মণ—বেদানভিজ্ঞ, এমন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার উপদ্রব-স্বরূপ। মানস-যজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ সকলেই উহার অংশগ্রহণে অভিলাষী হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ বৈশ্য-সংসর্গী হইলেও তাঁহার অপর তিন বর্ণের (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,) যজ্ঞ-সাধন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ —ব্রহ্মণ্যদেবস্বরূপ আর যখন

ব্রাহ্মণাদি—সর্ব্ববর্ণের যজ্ঞে অধিকার আছে।

ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণ ব্রাহ্মণের জ্ঞাতি।

(১) ষষ্টিতম অধ্যায়।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন ঐ তিনবর্ণ ব্রাহ্মণের জ্ঞাতি-স্বরূপ।

বিষ্ণু-সংহিতায় দৃষ্ট হইবে (১),—অগ্রে মাতার নিকট হইতে জন্ম অর্থাৎ মাতৃগর্ভে জন্মে; মৌঞ্জীবন্ধন (উপনয়ন) দ্বিতীয় জন্ম—এই জন্মে,-গায়ত্রী—মাতা এবং আচার্য্য পিতা হন। এই জন্য তাহাদিগের দ্বিজত্ব।

বিষ্ণু সংহিতার উক্তির সমর্থনে—মহাভারত বলিতেছেন(২)—

গুণাশ্রয়ে বর্ণান্তর-প্রাপ্তি।

"শ্রোত্রিয় লক্ষণ ত্রিবিধ—জন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ, সংস্কার হইতে দ্বিজ, বিদ্যা দ্বারা বিপ্রত্ব;" এবং ইহাও উক্ত আছে—"জন্মের দ্বারা শূদ্র, সংস্কার হইতে দ্বিজ, বেদপাঠ হইতে বিপ্র এবং ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়।" (৩)

যদি কখনও এক জাতি হইতে বর্ণচতুষ্টয়ের উদ্ভব না হইত—তাহা হইলে মহাভারতকার অথবা কোন ঋষিই উপরোক্ত শ্লোক সাহস করিয়া উল্লেখ করিতে পারিতেন কি?

পাঠক! দেখিবেন—উক্ত শ্লোকদ্বয়ে—বংশগত জাতিবিভাগ

---

(১) মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনম্। ৩৭
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী ভবতি পিতা ত্বাচার্য্যঃ। ৩৮
এতেনৈব তেষাং দ্বিজত্বম্। ৩৯॥
২৮ অধ্যায়, দ্বিজত্ব-সংস্কার-বিধান।

(২) জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রতাং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়-লক্ষণম্॥

(৩) জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদ-পাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

স্বীকৃত হয় নাই। তবুও যদি কেহ বলেন,—ব্রহ্মকে জানিয়া যে ব্রাহ্মণ, সে ব্রাহ্মণ কখন আদি (মূল) জাতি হইতে পারে না সুতরাং এক অখণ্ড ব্রাহ্মণ হইতে সকল জাতির উদ্ভব, ইহা—অসিদ্ধ, তাহা হইলে উত্তরে আমরা বলিব,—তর্কস্থলে যেন উহা—অসিদ্ধ স্বীকারই করিলাম; কিন্তু "জন্মনা জায়তে শূদ্র" বহাল রাখিতে হইলে স্বীকার করিতেই হইবে—এক শূদ্র হইতে "সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে" হইবে। ইহাতে আক্ষেপকারিগণ রাজি থাকিবেন ত?

আসল কথা।

আসল কথা—গুণ ও কর্ম্মাশ্রয়ে—এক হইতে বহুর উৎপত্তি—ইহাই হইল জাতি বিভাগের প্রকৃত রহস্য। তাহা—ব্রাহ্মণের দিক দিয়া দেখিলেও অসিদ্ধ হইতে পারে না,—শূদ্রের দিক দিয়া দেখিলেও একজাতীয়ত্ব কিছুতেই অসিদ্ধ হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়

পরাধীন হিন্দুজাতি ছাড়া—স্বাধীন আর্য্যজাতি সহ পৃথিবীর যত প্রবল বা দুর্ব্বল জাতির কথা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছে, তাহার কোন জাতির মধ্যে বংশগত বর্ণ-বিভাগ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র গুণগত ভাবে সকল জাতিতে বিদ্যমান আছে—দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল জাতি-মধ্যে গুণগত বর্ণ-বিভাগ।

স্তুতরাং ভারতে বংশগত জাতি-বিভাগ ভবিষ্যতে লোপ পাইলেও—অন্তঃকরণ নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ের দমন, বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, ধর্ম্মের নিমিত্ত কষ্ট-সহন, ক্ষমভাব, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর সম্বন্ধীয় সারল্য, আস্তিক্যবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান এবং পরমাত্ম-তত্ত্বানুভব এই গুণ যাহার মধ্যে স্বাভাবিক তিনিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য থাকিবেন। শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধ হইতে পলায়নে অপ্রবৃত্তি, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এই গুণ যাহার মধ্যে স্বাভাবিক তিনিই ক্ষত্রিয় পদবাচ্য হইবেন। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য করিবার প্রবৃত্তি যাহার মধ্যে স্বাভাবিক তিনি বৈশ্য পদবাচ্য হইবেন। পরিচর্য্যা-পরায়ণকে শূদ্র বলিয়া জানিতে হইবে।(১)। ইহাতে কোন বাধাই দৃষ্ট হইবে না। যে যেমন সে তেমন চলিবে—বেশ কথা।

ভবিষ্যতে বংশগত বর্ণবিভাগ লোপ পাইলেও —গুণগত বর্ণ রহিবে।

---

(১) গীতা—১৮ অধ্যায় ৪২, ৪৩, ৪৪ শ্লোক।

জগতের সকল জাতিই আর্য্য-সভ্যতানুসরণ করিয়াই প্রবল হইয়াছে। আর আর্য্যবংশধর হিন্দুজাতিই পৈত্রিক সভ্যতা বর্জ্জন করিয়া ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে—ইহা কি কম মন্দভাগ্য! আজ রাজশক্তি যখন হিন্দুর অধর্ম্মে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে রাজি নহেন, তখন তথাকথিত অব্রাহ্মণদের কর্ত্তব্য—গুণবর্জ্জিত, মাত্র যজ্ঞোপবীতগর্ব্বে গর্ব্বিত ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া—এক অখণ্ড বেদপন্থী ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি করিয়া জ্ঞানকর্ম্ম-সমন্বয়ে বেদানুসরণ করা।

বর্ত্তমান ভারতের আবশ্যক বেদানুসরণ-কারী এক অখণ্ড বেদপন্থী ব্রাহ্মণ-জাতির সৃষ্টি।

যাঁহারা আজ আপন সমাজ সংস্কার করিবার পথ পাইতেছেন না—হিন্দুর মধ্যে এমন যে কোন দুইটি জাতি একত্র হইলেই দেখিতে পাইবেন—সকল সংস্কারের মূলে যে বিশ্বগ্রাসী ভাব রহিয়াছে তাহা জাগিয়া উঠিবে। আর এই সংযোগের মধ্য হইতে যে বিরাট সঙ্ঘের উদ্ভব হইবে—তাহা হিন্দুর সকল দুঃখ, সকল দৈন্য সহজে দূর করিয়া শাস্ত্র মান্যকারীর কত বল তাহা অল্প সময়ের মধ্যে প্রমাণ করিতে পারিবে। মানুষ আজ যাহা অসম্ভব মনে করে, কাল যখন তাহা সম্ভবপর হয় তখন সেই মানুষই ভাবিতে পারে না কেমন করিয়া এই অসম্ভব সম্ভব হইল! জগতে আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া অনেক কাজ মনে হইলেও জাগতিক কাজ এমন কিছু বড় দেখা যায় না যাহা মানুষ প্রাণপাত পরিশ্রম দ্বারা সম্ভব করিতে পারে নাই।

অতএব উপবীতধারী হইলেই ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা পাইবেন, ইহা সাধুবাক্য নহে,—এমন কথা বেদ বা মনুর বাক্যে নাই। মনু গুণেরই মর্য্যাদা দিয়াছেন এবং সেই জন্যই গুণহীন ব্রাহ্মণ ত্যাজ্য বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

উপবীতধারী ব্রাহ্মণ মাত্রই পূজ্য নহে।

যাঁহারা এখনও মনে করেন ব্রাহ্মণ-সমাজ স্বর্গের চাবি হাতে করিয়া বসিয়া আছেন—তাঁহারা জানিয়া রাখুন মনু বলিতেছেন,—অজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধীয় অন্নের যত সংখ্যক গ্রাস ভোজন করে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পরলোকে ততগুলি শূলেষ্টি নামক তপ্ত লৌহপিণ্ড ভোজন করে। (১) যেমন কৃষক লবণ ভূমিতে বীজ বপন করিলে কোন ফললাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রাদ্ধকর্ত্তা অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে হব্যাদি দান করিলে পরকালে কোন ফল পায় না (২)।

অজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিষ্ফল জানিবে।

পাঠক! চমৎকৃত হইবেন না—ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিয়া যান। মনু পুনরায় বলিতেছেন,—যাহার উপনয়ন মাত্র হইয়াছে, কিন্তু বেদ অধ্যয়ন করে না, অথচ জটাধারী বা মুণ্ডিত এমন ব্রহ্মচারীকে এবং চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রিয়াসক্ত এবং বহুযাজী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না (৩)।

বেদাধ্যয়নরহিত—ও তৃণাগ্নি দুইই তুল্য। যেমন তৃণাগ্নিতে

---

(১) মনু—১৩৩ শ্লোক. ৩য় অধ্যায়।

(২) ঐ—১৪২ শ্লোক, ঐ।

(৩) ঐ—১৫১ শ্লোক, ঐ।

হোম করিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় এজন্য কেহ ভস্মে হোম করে না, সেইরূপ বেদাধ্যয়নরহিত ব্রাহ্মণকে হব্য-কব্য (দেব ও পিতৃকার্য্যে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবে না) দান করিবে না, করিলে নিষ্ফল হইবে (১)।

চিকিৎসাজীবী, দেবতার্থজীবী, মাংস, দুগ্ধ বিক্রয়ীকে হব্য-কব্য প্রদান করিবে না (২)।

গ্রাম্যলোকের অথবা রাজার বেতনগ্রহণপূর্ব্বক ভৃত্যতাকারী, কু-নখ ও বেশ-যুক্ত, কৃষ্ণদন্ত, গুরুর প্রতিকূলাচরণকারী, শ্রৌত স্মার্ত্ত অগ্নি পরিত্যাগী, সুদগ্রহণদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে (৩)।

'ক্ষয়রোগী, মেষাদি পশু পালক, (অকৃতদার জ্যেষ্ঠ থাকিতে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে সে ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ) পরিবিত্তি ও পরিবেত্তা উভয়কে, পঞ্চযজ্ঞরহিত, বেদবিদ্বেষ্টা, কুমন্ত্রণা দ্বারা বহুলোকের নেতা অথবা দেশের উপকারার্থ কেহ অর্থদান করিলে তাহা দেশের কাজে না লাগাইয়া যে আত্মসাৎ করে—ঐ সকল ব্রাহ্মণকে হব্য-কব্য প্রদান করিবে না (৪)।

'যে দ্বিজাতি প্রাতঃসন্ধ্যা অনুষ্ঠান এবং সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করে না, সে দ্বিজাতি বিহিত কর্ম্ম হইতে শূদ্রের ন্যায় বহিষ্করণীয়।' (৫)

---

(১) মনু—১৬৮ শ্লোক, ৩য় অধ্যায়।

(২) ঐ—১৫২ ঐ, ঐ।

(৩) ঐ—১৫৩ ঐ, ঐ।

(৪) ঐ—১৫৪ ঐ, ঐ।

(৫) ঐ—১০৩ ঐ, ২য় ঐ।

পাঠক, পিতৃপুরুষের স্বর্গ কামনা করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাতে পৌরহিত্য কার্য্যে এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনে যে সকল ব্রাহ্মণ আহুত হন তাঁহাদের দ্বারা যজমান কি ফল প্রাপ্ত হন, তাহা একবার আপনারাই বলুন ?

সদ্‌ব্রাহ্মণাভাবে স্বয়ং কার্য্য করণীয়।

আমাদের মনে হয় যতদিন হিন্দুসমাজে সংহিতার প্রতিষ্ঠা থাকিবে ততদিন প্রত্যেক যজমানকে পুরোহিত ও হব্য-কব্য প্রদানের জন্য দেখিয়া শুনিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণ আনিতে হইবে। শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য না করাইয়া বরং নিজেদের করাই বাঞ্ছনীয়, কারণ যেখানে পুরোহিত সংস্কৃত মন্ত্রাদির অর্থ স্বয়ং বুঝিতে না পারিয়া শুধু তোতাপাখীর ন্যায় ভুল, শুদ্ধ বা ভুলশুদ্ধ মিশ্রিত মন্ত্রপাঠ করিয়া যজমানকে উহার অর্থ বুঝাইতে না পারিয়াও সপ্রতিভ থাকেন—সেখানে মাতৃভাষাতে হিন্দুর সকল কর্ম্ম সম্পন্ন অবৈদিক হইবে কি না ঠিক জানি না—তবে দেবতা যে শুনিবেন,—পিতৃলোক যে তৃপ্ত হইবেন—তাহা সাধকশ্রেষ্ঠ কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, নানক, তুকারাম, কবীর, চৈতন্যদেব প্রভৃতির জীবন দেখিয়া দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিতে পারি। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মধুর "মা" ডাকে—বাঙ্গলা ভাষায় প্রার্থনায় মা যে চঞ্চলা হইয়া ছুটিয়া আসিতেন,—দেখা দিয়া ছেলের হাত ধরিয়া "মা" যে বেড়াইতেন—সে কথা আজ সকলেই জানেন। পুত্রের অসুখ দেখিয়া মা যে ভাষাতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, অন্তরের ব্যথা নিবেদন করেন,—বাবা তারকনাথের নিকট যে ভাষাতে নিজের দৈন্য জানাইয়া "হত্যা" দিয়া লোকে ফল পায়—

যে ভাষাতে প্রাণের কথা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা সহজে বলা চলে—যে ভাষার সঙ্গে পিতৃপুরুষ চিরদিন পরিচিত—দেবতা ভক্তের যে কথায় যে আত্মনিবেদনে অভ্যস্ত—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সেই ভাষাতে আত্মনিবেদন করিলে কখনও দোষাবহ হইতে পারে না।

আর্য্যজাতির ভাষা ছিল, সংস্কৃত,—বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গলা।

বিনা আপন ভাষা মিটে কি আশা ?

আর্য্যজাতি তাঁহাদের মাতৃভাষাতে সামগান করিয়াছেন। বাঙ্গলার পূর্ণচন্দ্র নিমাই, দ্বিতীয়ার চাঁদ গদাধর, সাধক বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ,—রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত-প্রমুখ শক্তি-মন্ত্রের উপাসকগণও মাতৃভাষাতেই গান গাহিয়াছেন—ভগবান্ শুনিয়াছেন, জগৎও শুনিয়াছে।

জীবন্ত, জাজ্জ্বল্যমান ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত—বর্ত্তমানকালের সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সাধন ও সমন্বয়কারী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন-ধন দেখিয়াও কি কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে ? মাতৃভাষার সাহায্যেও সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, মানব পূর্ণ-মনোরথ হয় একথা আজ কে না জানে ?

সংস্কৃত-বিদ্যা ব্যতিরেকেও মাতৃভাষায় ধর্ম্মকার্য্যে ফল-লাভ হয়।

ফলতঃ গত কয়েক শতাব্দীর সাধকপ্রবর-গণের জীবনী হইতে আমরা ভগবানের এই স্পষ্ট প্রকৃষ্ট ইঙ্গিত পাই যে—সংস্কৃত বিদ্যাদি ব্যতিরেকেও দেব-কার্য্য নিজ ভাষায় করিলেও ফল পাওয়া যায়। যে ভাষা বোঝা যায় না, পুরোহিত পর্য্যন্ত যাহা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণক্ষম নহে, বুদ্ধিমান্ হিন্দুগণ এখন ভাবিয়া দেখুন—সেই ভাষার পরিবর্ত্তে মাতৃভাষাতে

দেবতার নিকট নিজেই আত্মনিবেদন করিবেন, পিতৃশ্রাদ্ধাদি নিজেই করিবেন—অথবা, মূর্খ,—সংস্কৃত ভাষাতে অক্ষম, এমন প্রতিনিধি পুরোহিত ঠাকুর নিযুক্ত করিবেন?

মনু বলিতেছেন,—যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অর্থশাস্ত্রাদির যত্ন করে, সেই দ্বিজ পুত্রাদির সহিত জীবিতাবস্থাতেই শূদ্রত্ব লাভ করে।' (১)

মনু।

ভারত আজ শূদ্রপূর্ণ—এদেশে সদ্‌ব্রাহ্মণ, বেদনির্দ্দিষ্ট খাঁটি ব্রাহ্মণ যে একেবারে নাই তাহা কেহ বলিবে না। তবে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সংখ্যা—"কোটিতে গুটি" মাত্র। সুতরাং ইঁহাদিগকে অন্নারম্ভে বা শ্রাদ্ধে পাওয়া অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অতএব উপায়?

বর্ত্তমানে—ভারত শূদ্রপূর্ণ, খাঁটি ব্রাহ্মণ—"কোটিতে গুটি।"

পাঠক! প্রথমে দেখিলেন—মনু, অত্রি ও ব্যাস—স্বীকার করিলেন ব্রাহ্মণই কর্ম্ম-সহায়ে বিভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়া বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি ঘটাইয়াছে। পরে দেখিয়াছেন—কোন্ ব্রাহ্মণ-ভোজনে কেমন ফল হইয়া থাকে ও তাহা হইতে জানিয়াছেন যে পুরাকালে উপবীত-ধারী হইলেই ব্রাহ্মণ পূজনীয় বলিয়া গণ্য হইতেন না।

অতঃপর দেখিবেন—পরবর্ত্তী যুগে, মূর্খ হইলেও ব্রাহ্মণকে পরম দেবতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আরও দেখিবেন—প্রথমে কি করিয়া শূদ্র জাতিকে যৌন সম্বন্ধ হইতে দূর করা হইল।

---

(১) যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥—মনু, ২য় অধ্যায় ১৬৮শ্লোক।

তারপর দেখিবেন—ধর্ম্মের নামে কতকগুলি স্থায়ী নিয়ম রক্ষা করিয়া শূদ্রের ন্যায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ব্রাহ্মণ সংশ্রব হইতে দূর করা হইল। এই ভাবে "এক" জাতি—"বহুতে" পরিণত হইল। বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মার উজ্জ্বল কল্পনাকে ম্লান করিয়া সমাজ যাহা লাভ করিয়াছিল—তাহারই ফলে ঐক্যবদ্ধ এক অখণ্ড জাতি—বিশ্লিষ্ট, বিচ্ছিন্ন, একতাহীন ও আত্মবিস্মৃত প্রায় হাজার বৎসর দাসত্ব ও দুর্দ্দশা ভোগ করিল।

ক্রমশঃ কিরূপে অন্যান্য বর্ণকে ব্রাহ্মণ সংশ্রব হইতে দূর করা হইল।
পরিণাম।

পঞ্চম অধ্যায়

জাতি বিভাগ রহস্য বা "একত্বে বহুত্ব" সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার ছিল তাহা পূর্ব্বে কতক বলা হইয়াছে। এই বার—কি ভাবে সেই আদর্শ খর্ব্ব করিয়া ব্রাহ্মণকে বড় করিবার চেষ্টার ফলে ব্রাহ্মণ-সমাজের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল—তাহাও সংহিতায়ই দৃষ্ট হইবে।

মনু বলেন,—(এ কোন মনু?) *—যেমন অগ্নি সংস্কৃত বা অসংস্কৃত হইলেও সমভাবে দগ্ধ করে বলিয়া মহাদেবতা, সেইরূপ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হউক আর মূর্খ হউক, পরম দেবতা। (১)

পাঠক, দেখিবেন আদর্শবিচ্যুতি কতদূর ঘটিয়াছে। তার পর আরও আছে—ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি হননের জন্য দণ্ডাদি নিপাতিত না করিয়া কেবল উদ্যত করিলেই তাহাকে তামিস্র নরকে একশত বৎসর পরিভ্রমণ করিতে হইবে। (২) ক্রোধ-পরবশ হইয়া জানিয়া শুনিয়া তৃণদ্বারাও যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তাড়না করে, সে সেই পাপে একবিংশতি

---

* যিনি 'প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ' বলিয়াছেন—তিনি যে এমন বাজে কথা বলিতে পারেন না তাহা বলাই বাহুল্য।

(১) মনু—৯ অধ্যায়, ৩১৭ শ্লোক। (২) ঐ—৪র্থ অধ্যায়, ১৬৫ শ্লোক।

সংখ্যক জন্ম কুক্কুরাদি নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। (১) অস্ত্রাঘাতে ব্রাহ্মণের অঙ্গ হইতে নির্গত রক্তদ্বারা যতগুলি ধূলি একত্র হয়, অস্ত্রঘাতক পরলোকে তত সংখ্যক বৎসর শৃগাল কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। (২) ব্রাহ্মণ জন্মিবামাত্র দেবতাদিগেরও পূজ্য হন, তাহার কথা প্রত্যেক লোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপদেশই বেদ বলিয়া জানিবে। (৩)

পাঠক! বুঝিতে পারিলেন কি এ কেমন ব্রাহ্মণের কথা যিনি জন্মিবামাত্রই "জন্মনা জায়তে শূদ্র" না হইয়া একেবারেই ব্রাহ্মণ হইয়া দেবতারও পূজ্য হন! আমরা কিন্তু এতথ্য সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যতদিন তথাকথিত অব্রাহ্মণগণ ক্রিয়াকর্ম্মে পুরোহিতের দ্বারস্থ হইবেন, যতদিন জনসাধারণ ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্রে অজ্ঞ এবং নিজ ক্রিয়াকর্ম্মে অলস থাকিবেন ততদিন পুরোহিতগণ অলস ও অক্ষমগণকে নরকভীতি নিবারক অতি সহজে স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় মূর্খ সদাচারহীন ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করাইতে বিরত হইবেন না। তথাকথিত অব্রাহ্মণগণ সংহিতার একটি শ্লোক দেখিয়া বিচার না করিয়াই নিজেকে অন্ত্যজ মনে করিয়া নিজাধিকার ত্যাগ করিতে পারেন—তাহা তিনি করুন; তাহার জন্য আমরা ব্রাহ্মণকে দোষী করিতে পারি না। কিন্তু দেব ও পিতৃকার্য্যে হিন্দু সমাজের কর্ত্তব্য শিক্ষা-

(১) ঐ—৪র্থ অধ্যায়, ১৬৬ শ্লোক। ২) ঐ—৪র্থ অধ্যায়, ১৬৮ শ্লোক।

(৩) ঐ—১১শ অধ্যায়, ৮৫ শ্লোক।

দীক্ষাহীন ব্রাহ্মণগণকে কাজে একেবারে অবসর দেওয়া। নতুবা প্রত্যবায় তাঁহাদিগকেই ভুগিতে হইবে।

মনু সংহিতায় এমন কতকগুলি শ্লোক আছে যাহা বাদ দিলে কোন ক্ষতি হয় না। বংশগত জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা এত ভীষণ দোষাবহ হইত না যদি অনুলোম প্রতিলোম এই উভয়বিধ বিবাহ সহ—স্বয়ম্বর প্রথা, আটরকম বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকিত এবং বংশগত শূদ্রের সংস্কারবিধি স্বীকৃত হইত। আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই কি করিয়া হিন্দু রাজার শাসনে ব্রাহ্মণ কন্যা শূদ্রগৃহে গমন করিয়া চণ্ডালের জননী হইয়াছিলেন—অথবা অন্যান্য উচ্চবর্ণের কন্যারা নিম্নবর্ণের গৃহে যাইয়া—অথবা নিম্ন জাতীয় কন্যারা উচ্চবর্ণের স্বামী হইতে এতগুলি বর্ণহীন ও অন্ত্যজ জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন ?

সংহিতায় বীজ প্রধান বলিয়া যে স্বীকারোক্তি রহিয়াছে (মনু—৯ম অধ্যায়, ৩৬-৪০ শ্লোক) তাহার পরেও অন্ত্যজ জাতি কার পাপে জন্মাইল কে বলিবে ? অথচ ব্রাহ্মণ জন্মিবামাত্র দেবতারও পূজ্য !! এ রহস্যের মীমাংসা কে করিবে ?

আমরা মনু সংহিতা, অত্রি সংহিতা, মহাভারতাদি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি—যে এক ব্রাহ্মণ জাতিই—কর্ম্মাশ্রয়ে বহুবর্ণ হইয়াছে। সুতরাং একই ব্রাহ্মণ কর্ম্মসহায়ে যে সকল বর্ণে অভিহিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনুলোম ও প্রাতলোম কোন প্রথাতেই অন্ত্যজ জাতি জন্মিতে পারে না। এজন্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে “পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে”।

নিজ পরিচয়ে সকলেরই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়া দরকার।

অত:পর তথাকথিত উচ্চনীচ অব্রাহ্মণগণ যেন নিজ পরিচয়ে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করেন—শুধু "দেবশর্ম্মণ" বলিয়া নহে। বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, লাহিড়ি, সান্ন্যাল প্রভৃতি উপপদ ও গোত্র গ্রহণ করিয়া পরিচয় দেওয়াই বিধেয়। এত শাস্ত্রবাক্য শুনিয়াও অশাস্ত্রীয় পরিচয় দেওয়া খুব ধার্ম্মিকের লক্ষণ বলিয়া কিন্তু আমাদের মনে হয় না। তথাকথিত অব্রাহ্মণগণ নিজকে যতটা দূরে রাখিবেন—ব্রাহ্মণ সমাজও ততটা দূরেই থাকিয়া অজ্ঞতা-প্রসূত যত রকম অপচার সম্ভবে তাহা করিতে থাকিবেন। এই জন্য তথাকথিত অব্রাহ্মণগণের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়া এবং উপপদ সহ গোত্র গ্রহণ করা।

সংহিতায় আছে,—"মহা তেজস্বী সেই স্বয়ম্ভূর মুখ হইতে ব্রাহ্মণ (স্কন্ধের উপরিভাগ), বাহু হইতে ক্ষত্রিয় (স্কন্ধের নিম্নদেশ হইতে কোমর পর্য্যন্ত), উরু হইতে বৈশ্য (কোমরের নিম্ন হইতে হাটু পর্য্যন্ত), পাদদেশ হইতে (হাটুর নিম্নভাগ হইতে গোড়ালী পর্য্যন্ত) উদ্ভব হইয়াছে। অথবা বিরাট্ পুরুষকে ভাবিতে হইলে সেই পুরুষের স্কন্ধের উপরিভাগ ব্রাহ্মণ, স্কন্ধের নিম্নদেশ হইতে কোমর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়, কোমরের নিম্ন হইতে হাটু পর্য্যন্ত বৈশ্য এবং হাটুর নিম্নে সমস্ত অঙ্গ শূদ্র বলিয়া জানিবে। কিন্তু পাঠক দেখিবেন কি ভাবে ক্রমশঃ এই বিরাট্ পুরুষের পাদযুগল শূদ্রকে শরীরের অংশ হইতে ক্রমশঃ অস্বীকার করা হইয়াছে। যে কেহ, একগাছি দড়ি দিয়া নিজের

হাটুর নিম্নটা সজোরে বাঁধিয়া রাখিয়া দেখিবেন—অবস্থা কি রকম দাড়ায়! তারপর কোমরে ও গলায় দড়ি দিয়াও যদি বাঁচিয়া থাকেন আমাদিগকে জানাইবেন কি সুখে আপনি বাঁচিয়া আছেন। আমরা না হয় একবার গিয়া দেখিয়া আসিব। আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের ঠিক এই দশা। ইহা হইল বংশগত জাতিবিভাগের অবশ্যম্ভাবী ফল—"বার রাজপুতের তের হাঁড়ি।" কবে কোন্ অতীতে (Bogus) ভাক্ত-সংহিতাকার শূদ্রকে পাদ হইতে উদ্ভূত বলিয়া যে কল্পনা করিয়াছিলেন কালে তাহা হইতে শূদ্র একটা পৃথক জাতি দ্বিজাতির সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিতে বাধ্য হইল। জ্ঞানহীন, তেজহীন, ব্যবসা-বুদ্ধি-হীন যাহারা, তাহারা শূদ্র একথা বলিলে সহজে জাতিবিভাগ-রহস্যের মীমাংসা হইতে পারিত। কিন্তু ব্রাহ্মণের "ঘরের গরু" যে দেবতারও পূজ্য হন যত গোল ত এইখানে।

তবুও একদিন দ্বিজাতির শ্বশুর বলিয়া শূদ্রের যে মর্য্যাদা ছিল তাহার নিদর্শন সংহিতায় থাকিলেও সমাজ হইতে সে ব্যবস্থা বিনা প্রতিবাদে একবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল। রটনা রহিল শূদ্র,—চণ্ডালের জন্মদাতা।

শূদ্র যে দ্বিজাতি নহে তাহার হেতু মনু সংহিতায় ২য় অধ্যায় ১৬ শ্লোকে দেখিতে পাইবেন। অথবা জানিয়া রাখুন মন্ত্র দ্বারা যাহাদের জন্ম হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহারা দ্বিজ যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। শূদ্রের মন্ত্রের বালাই নাই; যেহেতু সে নিরক্ষর, সে অধিকার তাহাকে দেওয়া হয় নাই, সুতরাং সে দ্বিজাতি নহে। ইহার বেশী যুক্তি কেহ

যেন সংহিতায় আশা না করেন। মানুষের পায়ে সামান্য কাঁটা ফুটিলে সে অচল হইয়া পড়ে আর একটা সমগ্র জাতির পা দুখানা অবশ করিয়া রাখিলে তাহার কি অবস্থা হয় ?

সেইজন্য শূদ্র নামধেয় আপন রক্ত, আপন ভাইকে পৃথক ভাবে দ্বিজাতির পাশে সংস্কারহীন জাতিরূপে রাখিয়া যাহা হইয়াছিল তাহা কবির ভাষায় বলিতে গেলে এই রকম শুনাইবে,—

"আপনি মজিলে রাজা লঙ্কা মজাইলে"।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋগ্বেদে (নবম মণ্ডল, ১১২ সূক্ত, ১।৩ ঋক) গুণগত কর্ম্মই প্রচলিত ছিল। ঐ সময় এক অখণ্ড জাতি, গুণ-তারতম্যে, জীবিকার্জ্জনের জন্য, যাহার যেমন সাধ্য ও অভিরুচি, সে তেমন কর্ম্ম করিত। পরবর্ত্তী যুগে সেই কর্ম্ম আশ্রয়ে বর্ণের সূচনা হইল; তখনও এক বংশ হইতে গুণ-তারতম্যে মানুষ ব্রাহ্মণাদি বর্ণে স্থান লাভ করিত। নিম্নে একখানা বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইল। বংশ-পরিচয়ের এই সামান্য অংশ হইতে সকলেই দেখিতে পাইবেন,—(ক) একই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও, গুণ-তারতম্যে বিভিন্ন বর্ণ আশ্রয় করিতে পারে, সেই বংশ হইতে আবার উচ্চ বর্ণে গমন করিবার প্রথা ও আছে। (খ) চারি বর্ণ কর্ম্মানুসারে বিদ্যমান থাকিলেও মূলতঃ তাহারা যে এক অখণ্ড জাতিই ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাহারা নামের শেষ ভাগে শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূতি, দাস প্রভৃতি উপপদ ব্যবহার করিত না। (গ) গোত্র বা বংশ বর্ণগত হইলেও স্বমহিমায় যিনি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন তিনি নূতন গোত্র গ্রহণ করিয়া সমাজে পরিচিত হইতেন।—ভাগবত, নবম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়।

সূর্য্যবংশ

পরম পুরুষ—তন্নাভি হইতে হিরণ্ময় পদ্ম, তাহা হইতে
|
চতুরানন স্বয়ম্ভু—তাঁহার মন হইতে
|
মরীচি
|
কশ্যপ + দাক্ষায়িনী (স্ত্রী)
|
বিবস্বান্ + সংজ্ঞা (")
|
রাজর্ষি শ্রাদ্ধদেব মনু + শ্রদ্ধা (")

এই শ্রাদ্ধদেব মনুর দশ পুত্র। তন্মধ্যে ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম ও ৯ম বংশ পরিচয় নিম্নে দেখান হইল।

৪। শর্য্যাতি ৫। দিষ্ট ৭। করূষ ৮। পৃষধ ৯। নভগ

৪। শর্য্যাতি—বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ ইনি অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন।

৫। দিষ্ট—ইহার পুত্র নাভাগ—ইনি কর্ম্মবশে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে ১১শ রাজা করন্ধম ক্ষত্রিয় হন। করন্ধম-পুত্র মরুত্ত ক্ষত্রিয় রাজচক্রবর্ত্তী।

৭। করূষ—ইহাঁ হইতে উত্তরাপথরক্ষক ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়, পরে সেই ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন।

৮। পৃষধ—শূদ্র হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন।

৯। নভগ—পুত্র নাভাগ—পুত্র অম্বরীষ, সপ্তদ্বীপপতি—ইঁহার তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ বিরূপ—পুত্র পৃষদশ্ব—পুত্র রথীতর। রথীতরের পুত্রকন্যা হয় নাই। এই হেতু ইহার প্রার্থনা অনুসারে নিয়োগ প্রথায় মহর্ষি অঙ্গিরা তদীয় ভার্য্যায় কতিপয় পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা রথীতর গোত্রে খ্যাত।—ভাগবত ৯ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়।

সুতরাং দেখা গেল :—

১। ক্ষত্রিয় বংশজাত করুষ রাজার বংশ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। ক্ষত্রিয় বংশজাত দিষ্ট রাজ-পুত্র নাভাগ—কর্ম্মবশে বৈশ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩। ক্ষত্রিয় বংশজাত নাভাগ বৈশ্য হইলেও তাহার বংশধরগণ পুনরায় ক্ষত্রিয় রাজা এবং তদ্বংশে সুবিখ্যাত মরুত্ত—রাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

৪। ক্ষত্রিয় বংশজাত মনুপুত্র পৃষধ—শূদ্র হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন।—সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য পালনে শূদ্রেরও অধিকার স্বীকৃত।

৫। ক্ষত্রিয় বংশজাত মনুপুত্র নভগের বংশে রথীতর। নিয়োগ-প্রথায়, মহিষীগর্ভে মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে ইঁহার ক্ষেত্রজ পুত্রগণ জাত; ও ইঁহাদের রথীতর-গোত্র খ্যাতি।

৬। মনুর বংশে একই গোত্র মধ্যে পুনরায় গোত্র উদ্ভূত। যথা মনুবংশেই রথীতর গোত্রের সৃষ্টি।

উপরোক্ত সনাতনবিধি অস্বীকার করিয়া কি উপায়ে সমগ্র জাতিকে ছন্নছাড়া করতঃ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা করিতে হইয়াছিল তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

স্থায়ী বর্ণ-বিভাগের ক্রমবিকাশ

কি করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ব্রাহ্মণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এখন তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে বলা হইয়াছে—

যাহাদিগের গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত ক্রিয়াকলাপ মন্ত্র দ্বারা কথিত আছে, তাঁহাদিগের এই মানব শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও শ্রবণের অধিকার,—শূদ্রাদির অধিকার নাই।

গুণগত জাতির পক্ষে ইহা স্বাভাবিক—যে বিদ্যাহীন, তেজহীন, ব্যবসা-বুদ্ধিহীন সে সেবা ভিন্ন অন্য কাজ করিবার পক্ষে উপযুক্ত নহে, কিন্তু দ্বিজাতির জন্ম হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত মন্ত্রাদি নিজেদেরই পড়িতে হইত। শূদ্র মন্ত্রদ্বারা গৃহোক্ত কাজ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া সে কেন যে মানবশাস্ত্র শুনিতেও পারিবে না—তাহা ঠিক বোঝা গেল না! ইহা ছাড়া যে গুণগত জাতিকে পরে বংশগত জাতিতে (অনুলোম বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া) পরিণত করা হইয়াছিল, সেই শূদ্রের বংশে যে কেহই বুদ্ধিমান্ জন্মাইবে না, এমন কথা কে বলিয়াছিল যাহার জন্য মানবশাস্ত্র শুনিবার অধিকার পর্য্যন্ত শূদ্রের থাকিল না?

সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন বংশগত শূদ্রজাতির এ অধিকার কেন নাই? এ প্রশ্নের উত্তরে রক্ষণশীলগণ হয় ত বলিবেন—মনু বলেন নাই। কেন বলেন নাই? বোধ হয় উত্তর হইবে—যাও, মনুকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর। আমরা সমাজকে যে ভাবে পাইয়াছি তাহাই রক্ষা করিয়া চলিব। তথাপি ইঁহারা স্বীকার করিবেন না যে—মনু ১।৯১ শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য মেধাতিথি কি বলিয়াছেন। তবুও ব্রাহ্মণ সমাজ বলিয়া থাকেন, শূদ্রজাতিকে ব্রাহ্মণ পুত্রবৎ স্নেহ করেন! এ স্নেহ কেমন তাহাও পাঠক জানিয়া রাখুন,—

শূদ্রকে বিষয় কর্ম্মের কোন উপদেশ দিবে না, ভৃত্য

ব্যতিরেকে শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিবে না। হোমের অবশিষ্টাংশ শূদ্রকে দিবে না। শূদ্রকে কোন ধর্ম্মোপদেশ দিবে না। ব্রাহ্মণ মধ্যবর্ত্তী না রাখিয়া শূদ্রকে সাক্ষাৎ ভাবে ব্রতাদি উপদেশও করিবে না। (১)

ব্রাহ্মণের—শূদ্রপ্রীতির চমৎকার নিদর্শনই বটে!

যিনি আপন দেহ হইতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিও বোধ হয় শূদ্রকে এতখানি প্রীতি দেখাইতে পারেন নাই।

ব্রহ্মা ব্রাহ্মণের জন্য অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কর্ম্ম কল্পনা করিলেন। (১)

ক্ষত্রিয়দিগের—প্রজা-প্রতিপালন, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও স্রকচন্দন বিষয়ে অনাসক্তি ব্যবস্থা করিলেন। (২)

বৈশ্যদিগের পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জল ও স্থল পথে বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এবং বৃদ্ধি জন্য ধন-প্রয়োগ (সুদেটাকা খাটান) কল্পনা করিলেন। (৩)

ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের গুণদোষ বিচার না করিয়া এক মাত্র পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিলেন। (৪)

কিন্তু আচার্য্য মেধাতিথি এই শ্লোকের ভাষ্য লিখিতে যাইয়া বলিতেছেন—(ভাবার্থ) প্রভু প্রজাপতি শূদ্রকে অসূয়া-বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য স্থির

---

(১) মনু—৪র্থ অধ্যায়, ৮০ শ্লোক।

(১) মনু—১ম অধ্যায়, ৮৮ শ্লোক। (২) ঐ, ঐ—৮৯ শ্লোক। (৩) ঐ, ঐ—৯০ শ্লোক। (৪) ঐ, ঐ—৯১ শ্লোক।

করিয়াছেন। ইহাতে শূদ্রের দানাদির (অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান) অধিকার নিষিদ্ধ হয় নাই—এবং স্বরূপ-বিভাগে যে শূদ্রের যাগযজ্ঞের অধিকার আছে তাহাও দেখাইব। (১)

প্রচলিত নিয়ম ঐ রকম না থাকিলে আচার্য্য মেধাতিথি যে এমন কথা বলিতে পারিতেন না তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শুধু অনুমান নহে—৯ম অধ্যায়ের ৩৩৫ শ্লোকে আছে—শুচি, উচ্চবর্ণের শুশ্রূষা-পরায়ণ, অহঙ্কার-শূন্য, মধুর-ভাষী শূদ্র শ্রেষ্ঠতা লাভ করে অর্থাৎ বৈশ্যের ন্যায় অশৌচাদির ব্যবহার করিতে পারে। শূদ্র যদি বৈশ্যের ন্যায় অশৌচপালন করিতে পারে তবে বৈশ্যের ন্যায় দান, যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন (১ম অধ্যায়, ৯০ শ্লোক) করিবার অধিকারও তাহার আছে একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি? আমরা শুধু শূদ্রের কথাই বলিতে আসি নাই। শূদ্রাশ্রয়ে যে সকল তথাকথিত অন্ত্যজ জাতির উদ্ভব হইয়াছে তাঁহারাও জানিয়া রাখুন শুচি, অহঙ্কার-শূন্য ও মধুর-ভাষী হওয়া তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য; এবং দান, যজ্ঞ

শূদ্র ও তথা-কথিত শূদ্রেতর অন্ত্যজ জাতি সকলের পথ।

(১) প্রভুঃ প্রজাপতিঃ একং কর্ম্ম শূদ্রস্যাদিষ্টবান্, এতেষাং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানাং শুশ্রূষা ত্বয়া কর্ত্তব্যাঽনসূয়য়াঽনিন্দয়া চিত্তেনাপি তদুপরি বিষাদো ন কর্ত্তব্যঃ। শুশ্রূষা পরিচর্য্যা তদুপযোগি কর্ম্ম-করণং শরীর-সংবাহনাদি চিত্তানুপালনম্। এতদ্দৃষ্টার্থং শূদ্রস্য অবিধায়কত্বাচ্চৈকমেবেতি ন দানাদয়ো নিষিধ্যন্তি। বিধিরেষাং কর্ম্মণানুত্তরত্র ভবিষ্যতি অতঃ স্বরূপ-বিভাগেন যাগাদীনাং তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ॥

ও বেদাধ্যয়নে তাঁহাদেরও উৎসাহ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

কিংকর্ত্তব্য। শারীরিক বলে কোন জাতিই প্রবল হইতে পারে না, যদি তাহার "নৈতিক মেরুদণ্ড" সবল ও সোজা না থাকে। আমরা তথাকথিত শূদ্র এবং অন্ত্যজ বর্ণাদির নৈতিক উন্নতির জন্য হারিত সংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ের বিবাহবিধি ছাড়া অপর অংশ পড়িয়া তদনুসারে নিত্য কর্ম্ম করিতে এবং সকলকে উপবীত গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা ও গায়ত্রী জপ করিতে অনুরোধ করি। এক ব্রাহ্মণ জাতিই যখন বিভিন্ন জাতি বা বর্ণে রূপান্তরিত বা পরিণত হইয়াছে, তখন সকলেরই সেই একই ভাবে নিত্য কর্ম্ম করাই বিধেয়।

উপনয়ন-কাল নির্দ্ধারণ-পথে

তারপর উপনয়নের সময় পার্থক্য করিয়া দেওয়া হইল, যথা :—গর্ভ হওয়াবধি অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন দেওয়া উচিত। গর্ভের দশবৎসর তিনমাস পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের, একাদশ-বৎসর তিনমাস মধ্যে বৈশ্যের উপনয়ন-সংস্কার করিবে। (১)

বেশ-ভূষা ও মেখলায়

বেশ-ভূষা। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শণতন্তু বস্ত্র পরিধান করিবে ও কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম উত্তরীয় করিবে। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী ক্ষৌম বসন পরিধান ও রুরুমৃগচর্ম্মের উত্তরীয় করিবে। বৈশ্য ব্রহ্মচারী—মেষলোম নির্ম্মিত বসন ও ছাগচর্ম্মের উত্তরীয় গ্রহণ করিবে। (২)।

---

(১) মনু—২য়, ৩৬ শ্লোক।

(২) মনু—২য়, ৪১ শ্লোক।

শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্য—নাই, সুতরাং পোষাকের বালাইও নাই।

বিষ-বিসর্প।

এই পার্থক্য বা পৃথকীকরণ কার্য্য কেমন ধীরে ধীরে, নানাকর্ম্মের মধ্য দিয়া বিষ-বিসর্প-বৎ আসিতেছে ও সমাজ শরীরে বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত হইতেছে তাহা পাঠকও লক্ষ্য করিতে থাকিবেন।

মেখলায়।

এই পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য মেখলাতেও কেমন পৃথক ব্যবস্থা রহিয়াছে দেখুন—ব্রাহ্মণ সমান গুণত্রয়ে মিলিত সুখস্পর্শ মেখলা করিবে। ক্ষত্রিয় ধনুকের গুণ এবং বৈশ্য শণসূত্র-নির্ম্মিত ত্রিগুণিত মেখলা করিবে। (১)

মুঞ্জাদির অপ্রাপ্তিতে ব্রাহ্মণ কুশময়ী ত্রিগুণিত মেখলা, ক্ষত্রিয় অশ্মান্তক নামক তৃণ-নির্ম্মিত এবং বৈশ্য বল্বজ তৃণবিশেষ-নির্ম্মিত—মেখলা করিবে। মেখলা এক গ্রন্থিযুক্ত অথবা কুলনিয়ম অনুসারে তিন বা পঞ্চগ্রন্থিযুক্তও করিতে পারিবে। (২)

বিবাহ-পথে

অনুলোম প্রথা ও প্রতিলোম প্রথা।

এখন অনুলোম প্রথা যাহাকে বলে তাহা এই ঃ—শূদ্র কেবল শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিবে, বৈশ্য—শূদ্র ও বৈশ্য কন্যা, ক্ষত্রিয়—শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়কন্যা, ব্রাহ্মণ—অপর তিন বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন। (৩) ইহার বিপরীত প্রথা—অর্থাৎ নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে উহাকে প্রতিলোম প্রথা

(১) মনু—২য়, ৪২ শ্লোক।

(২) ঐ ঐ, ৪৩ শ্লোক।

(৩) ঐ ৩য়, ১৩ শ্লোক।

বুঝিতে হইবে। কিন্তু কামবশতঃ বিবাহ বলিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে সেই অনুলোম বিবাহে অনুমতি দেওয়ার অর্থ উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা মাত্র। আরও দৃষ্ট হইবে যে প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ করিতে যাইয়া প্রথম অংশে অনুলোম বিবাহের বিরুদ্ধে যাহা বলা হইয়াছে (১) এইরূপ অর্থসঙ্গতি-শূন্য শ্লোকের 'ভাবার্থের' অর্থ কি, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসিতে চাহিবে!

যাহা হউক, এ বিষয়ে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, সকল প্রকার পার্থক্যই ক্রমশঃ বিবাহ পথে সিদ্ধ হইয়াছিল। (বিবাহ-পদ্ধতিতে সবিশেষ দেখুন)।

দায়-বিভাগ পথে

ব্রাহ্মণের ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতীয়া বিবাহিতা স্ত্রীতে যে সকল সন্তান জন্মে তাহাদিগের প্রকার বিভাগ (দায়-ভাগ) পরশ্লোকে রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণী-পুত্রকে বিভাগের পূর্ব্বে একটি "কীনাশঃ কর্ষকঃ", হালের গরু, সেক্তা বৃষ এবং অশ্ব প্রভৃতি যান, অলঙ্কার, প্রধান গৃহ এবং যত অংশ হইবে উহার মধ্যে একটি প্রধান অংশ দিয়া পরের শ্লোকের মর্ম্মে ক্ষত্রিয়া-পুত্রাদিকে ধন বিভাগ করিয়া দিবে। (২) ব্রাহ্মণ তিন অংশ, ক্ষত্রিয় দুই, বৈশ্য পুত্র দেড় ভাগ, শূদ্র পুত্র এক ভাগ এ বিধায় সাড়ে সাত ভাগ হইল। সকল বর্ণের এক এক পুত্র স্থলে এইরূপ বিভাগ। যে স্থলে ব্রাহ্মণীর পুত্র এক ও ক্ষত্রিয়ার

(১) মনু—৩য়, ১৪ শ্লোক।

(২) ঐ—৯ম, ১৫০ শ্লোক।

পুত্র এক থাকিবে সে স্থলে সকল ধন পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন ভাগ ব্রাহ্মণী-পুত্রকে এবং দুই ভাগ ক্ষত্রিয়া-পুত্রকে দিবে। এই রীতিতে সব ভাগ কল্পনা করিবে। (১) অথবা উহার ভাগ না করিয়া পৈতৃক সমস্ত ধন দশ ভাগ করিয়া ব্রাহ্মণী-পুত্র চারি অংশ, ক্ষত্রিয়া-পুত্র তিন অংশ, বৈশ্যা-পুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রা-পুত্র এক অংশ গ্রহণ করিবে। (২)। যদি দ্বিজাতির চাতুর্ব্বণ্য পুত্র থাকে কিংবা দ্বিজাতির পুত্র না থাকে তথাপি ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাপুত্র দশম ভাগের অতিরিক্ত অংশ পাইবে না। * * * (৩)

এ পর্য্যন্ত ভাগে যাহা কিছু দিবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এইবার পিতা জীবদ্দশাতে যদি কিছু দেন তবে দিবেন—না দিলে মৃত্যুর পরে শূদ্রাপুত্র কোন ভাগ পাইতে পারে না স্থির হইল। যথা ঃ— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের শূদ্রাপুত্র কিম্বা অনূঢ়া-শূদ্রাপুত্রের ধনভাগ হয় না। (৪)

জীবিকা ও অধ্যাপনা পথে

ব্রাহ্মণাদির তপস্যা ও জীবিকা বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন —ভগবান্ ব্রহ্মা। এবার ব্রহ্মার বংশধর মনুর নামে ভৃগু ব্যবস্থা করিলেন—এই মানব শাস্ত্র ব্রাহ্মণগণ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন

---

(১) মনু—৯ম অধ্যায়—১৫১ শ্লোক।

(২) ঐ ঐ ১৫২, ১৫৩ শ্লোক।

(৩) ঐ ঐ ১৫৪ শ্লোক।

(৪) ঐ ঐ ১৫৫ শ্লোক।

করিবেন এবং শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করাইবেন কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কেহই অধ্যাপনা করাইতে পারিবেন না। (১) পরবর্ত্তী যুগে যখন যজ্ঞলোপ পাইয়াছিল তখন মহর্ষি অত্রি বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সম-তপস্যা কিন্তু জীবিকা অর্জ্জন পৃথক পৃথক ; যথা ঃ—ব্রাহ্মণের ছয়টি কার্য্য—তাহার মধ্যে যজন, দান, অধ্যয়ন এই তিনটি তপস্যা ; প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন—এই তিনটি জীবিকা। ক্ষত্রিয়ের পাঁচটি কার্য্য, তাহার মধ্যে যজন, দান, অধ্যয়ন এই তিনটি তপস্যা ; অস্ত্রব্যবহার ও প্রাণি-রক্ষণ অর্থাৎ রাজ্য শাসন ও পালন এই দুইটি জীবিকা। বৈশ্যের যজন, দান, অধ্যয়ন এই তিনটি তপস্যা ; কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, কুসীদ—এই চারিটি জীবিকা। শূদ্রের দ্বিজাতিসেবা—তপস্যা, শিল্প—জীবিকা। (২)

ভৃগুকর্তৃক মনু-সংহিতা অধ্যাপনায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির অধিকার লোপ। অত্রি।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে—মনু, বেদ ও স্মৃতি মান্য করিতে উপদেশ প্রদান করতঃ মতানৈক্যে—"প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ"—বলিয়াছেন। এবার পাঠক দেখুন—বেদ, স্মৃতি, শিষ্টাচার ও আত্মতুষ্টি এই চারিটিকে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রমাণ বলিয়া "মন্বাদি-শাস্ত্রকর্ত্তারা" নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। (৩)

উপপদযুক্ত পথে

উপরোক্ত ব্যবস্থার প্রভাবে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদির

---

(১) মনু—১ম অধ্যায়, ১০৩ শ্লোক।

(২) অত্রিসংহিতা—১৩।১৪।১৫ শ্লোক।

(৩) মনু—২য় অধ্যায়. ১২ শ্লোক।

নাম যথাক্রমে শর্ম্ম, বর্ম্ম, ভূতি, দাসাদি, মঙ্গল, বল, সম্পদ ও সেবা-সূচক উপ-পদ-যুক্ত করিবে, যেমন শুভশর্ম্মা, বলবর্ম্মা, বসুভূতি, দীনদাস প্রভৃতি। (১) শিষ্টাচারের চমৎকার নিদর্শন বটে! পাঠক দেখিবেন, প্রথমে সম তপস্যা স্বীকার করিয়া কর্ম্ম-প্রবাহে যেমন পার্থক্য সূচিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে একত্বকে স্থায়িরূপে-বহুত্বে পরিণত করিয়া রাখিবার জন্য শুভশর্ম্মা, বলবর্ম্মা বসুভূতি ও দীনদাস—নামের শেষে নিয়ন্ত্রিত করা হইল,—যেন কিছুতেই আর কখনও না মিশিতে পারে। অথচ মহাভারত, পুরাণ ও উপপুরাণে নামের সঙ্গে কোন উপ-পদ দৃষ্ট হইবে না। সুতরাং উপ-পদ নামের সহিত যুক্ত করা প্রাচীন প্রথা নহে।

বিভিন্ন উপপদ যোগে বর্ণ-পার্থক্য ও উহা স্থায়ী করণ কার্য্য সম্পাদন।

শাসন-তারতম্য পথে

অনূঢ়া শূদ্র-কন্যাতে পুত্রোৎপাদন করিবার অধিকার ব্রাহ্মণের ছিল। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ কন্যা গমনে কি ব্যবস্থা ছিল তাহাও পাঠক জানিয়া রাখুন। অনুলোম বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণত্রয়ের ভূতপূর্ব্ব শ্বশুর যদি কখন ব্রাহ্মণ কন্যা গমন করে—রাজার বিধানে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ হইবে। শুধু কি ইহাই?—মনু সংহিতার ৮ম অধ্যায়, ২৭৯-২৮৩ শ্লোক দেখুন—অনেক কিছু ছেদনেরই ব্যবস্থা রহিয়াছে যথা ঃ—

১। শূদ্র কর, চরণাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে প্রহার করিলে রাজা সেই শূদ্রের সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন—ইহা—"মনুর আজ্ঞা।"

---

১) মনু—২য়, ৩২ শ্লোক।

মনুসংহিতায় "মনুর আজ্ঞা" বলিবার হেতু—ইহা মনুর নিজের লেখা নহে বুঝিতে হইবে।

২। শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মারিবার জন্য হাত তোলে—সে হাত কাটা যাইবে—পা তুলিলে পা কাটা যাইবে।

৩। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসে—রাজা সেই শূদ্রের কটিদেশে তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

৪। কেহ যদি ব্রাহ্মণের গায়ে থুতু দেয় তাহার ওষ্ঠাধর কাটা যাইবে। ব্রাহ্মণের গাত্রে প্রস্রাব করিলে লিঙ্গ কাটা যাইবে।

৫। শূদ্র ব্রাহ্মণের কেশাকর্ষণ করিলে—কিম্বা হিংসা করিবার বুদ্ধিতে পাদদ্বয় গ্রহণে, চিবুক স্পর্শে বা অণ্ডকোষ ধরিলে সেই পাপে শূদ্রের হাত কাটা যাইবে।

৬। শূদ্র দ্বিজাতির প্রতি দারুণ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবে। যেহেতু, নিকৃষ্ট অঙ্গ—পাদ হইতে শূদ্রের জন্ম। (১)।

৭। শূদ্র হিংসা নিবন্ধন দ্বিজাতির নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহার মুখের মধ্যে ১০ অঙ্গুলি পরিমাণ দগ্ধ লৌহ শলাকা প্রবেশ করাইবে। (২)

৮। দর্প করিয়া শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে রাজা সেই শূদ্রের মুখে ও কর্ণে তপ্ত-তৈল নিক্ষেপ করিবে। (৩)

---

(১) মনু— ৮ম অধ্যায়, ২৭০ শ্লোক।

(২) ঐ ঐ, ২৭১ শ্লোক।

(৩) ঐ ঐ, ২৭২ শ্লোক।

এই রকম ব্যবস্থা দেখিয়া মনে স্বতঃই উদয় হয় যে—এই ভীষণ অত্যাচার নিবারণের জন্যই ভগবান্ এদেশে মুসলমানকে আনিয়াছিলেন এবং হিন্দু জাতির অবাধ জ্ঞানার্জ্জনের জন্য পরে ইংরাজকে আনিয়াছেন যাঁহার ব্যবস্থায় আপামর হিন্দু বেদ, সংহিতা, পুরাণাদিতে কি আছে জানিতে ও পড়িতে পারিতেছে।

শূদ্রের সহিত দ্বিজাতির সম্পর্ক লোপে হিন্দুজাতির—সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।

এই প্রকার স্বেচ্ছাচারপূর্ণ ব্যবহারেই শূদ্রের সহিত দ্বিজাতির সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল। বিরাট্ পুরুষের পাদদেশ অবশ হইয়া পড়িল—হিন্দুজাতির অগ্রগমনের আশা চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইল। একথায় হয় ত কেহ কেহ হাসিবেন জানি, আমরা কিন্তু এ ব্যবস্থা দেখিয়া হাসিতে পারিলাম না।

শব-বহন পথে

শূদ্রকে দূরে রাখিবার ব্যবস্থার মধ্যেই ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যকে পৃথক করিবার ইঙ্গিত।

পাঠক! সংহিতাকার ভৃগু, শূদ্রকে দূরে রাখিবার জন্য যে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন এবং সেই মন্ত্রের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে পৃথক করিবার যে ইঙ্গিত রাখিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। সংহিতায় আছে ঃ—শূদ্র মৃত হইলে তাহাকে বাড়ীর দক্ষিণ দ্বার দিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবে। বৈশ্যের শব পশ্চিম দ্বার দিয়া, ক্ষত্রিয়ের শব উত্তর দ্বার দিয়া এবং ব্রাহ্মণের শব পূর্ব্ব দ্বার দিয়া লইয়া যাইবে॥ (১)

(১) মনু—৫ অধ্যায়—৯২ শ্লোক।

আত্মীয় স্বজন থাকিতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মৃতদেহ শূদ্র দ্বারা বহন করাইবে না। যেহেতু শূদ্র-স্পর্শে মৃতের আত্মা অস্বর্গ-লোক প্রাপ্ত হয়। তবে যদি স্বজাতীয় না মিলে তখন ব্রাহ্মণের শব ক্ষত্রিয়ের দ্বারা তদভাবে বৈশ্যের দ্বারা, তদভাবে শূদ্রের দ্বারা বহন করাইবে। (১) অর্থাৎ যদি স্বজাতি দ্বারা মৃতদেহ বহন করাইবার সুবিধা না হয় তখন শূদ্র বহন করিলে মৃত আত্মা অস্বর্গ-লোক প্রাপ্ত হইবে না !

পাঠক, এইরূপ যুক্তির উপর আমরা মন্তব্য প্রকাশ করিতে অক্ষম। অথচ মহর্ষি অত্রি বলেন,—লাক্ষা-লবণ-সংমিশ্র কুসুম্ভ ক্ষীরসার্পিষাম্। বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ অত্রিসংহিতা—৩৭০॥ এ হেন শূদ্রের মৃতদেহ স্পর্শ করিবার অধিকার যে সংহিতাকার অস্বীকার করিলেন তিনিই আবার অনুলোম প্রথায় সেই শূদ্রের কন্যাকে দ্বিজাতির পত্নীত্বে গ্রহণ করিবার বিধান দিলেন। চমৎকার যুক্তি বটে !

অশৌচ-কাল-প্রভেদে

সপিণ্ড-মরণে ব্রাহ্মণ দশদিবসে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশদিবসে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবসে ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয় ॥ ৫।৮৩ ॥

সকল বিষয়ে পার্থক্য ছিল।

পাঠক,—দেখিবেন, বিবাহ, দায়বিভাগ, শব-বাহন, উপপদ ও মঞ্জীগ্রহণাদি—এই সকল বিধানসমূহের মধ্য দিয়া এমন ব্যবস্থা হইয়া গেল যাহাতে দ্বিজাতি—পৃথক জাতিতে পরিণত হইতে বাধ্য হইল। কি যজ্ঞোপবীত ধারণে, কি দণ্ড গ্রহণে অথবা ব্রহ্মচারীর

(১) মনু—৫ম অধ্যায় ১০৪ শ্লোক।

ভিক্ষা প্রার্থনায়, সকল বিষয়েই পার্থক্যের সৃষ্টি করা হইল। (মনু—২য় অধ্যায়—৪৪, ৪৬।)

আমাদের বিশ্বাস—সংহিতায় ব্রাহ্মণের জন্য বেশী সুবিধা দিলেও তেমন ক্ষতি কিছুই হইত না, যদি অনুলোম বা অসবর্ণ প্রথায় বিবাহ অচল না হইত। এই একপথে সকল বর্ণের রক্তে একতা ছিল। ইহার অবর্ত্তমানে সকলেই পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। পাঠক লক্ষ্য করিয়া যেন দেখেন প্রথমে অনুলোম প্রথাকে অতি কুৎসিৎ ভাষাতে নিন্দা করা হইয়াছে। তারপর "দায়বিভাগে" এমন জঘন্য নীচতা দেখান হইয়াছে যাহা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় কেন দাস-রাজা কন্যা সত্যবতীকে রাজা শান্তনুর করে অর্পণ করিবার সময় কন্যার ভাবী সন্তানের জন্য এতটা চঞ্চল হইয়াছিলেন।

পাঠক! জাতিবিভাগ-রহস্য দেখাইতে যাইয়া সম্ভব-মত সংক্ষেপে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, জানি না তাহা হইতে সংহিতাকারগণের কৃতিত্ব আপনারা ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন কি না? যদি ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়া থাকেন—তাহা হইলে আসুন—যাহা রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি করিতে সক্ষম হন নাই—আপনারা সকলে মিলিয়া হিন্দু-সমাজের মধ্যে থাকিয়া—ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহা সফল করিয়া তুলুন,—দেশকে, সমাজকে—ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করুন।

এতদিন নররূপী নারায়ণকে ঘৃণা করিয়া যথেষ্ট বলক্ষয় হইয়াছে। এবার সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বল সঞ্চয় করিতে সচেষ্ট হউন।

আপনারা তথাকথিত অন্ত্যজের দোষের কথা শুনিয়া পরস্পরে যথেষ্ট ঘৃণা দেখাইয়াছেন, নারী জাতির প্রথম রিপু অতিশয় প্রবল শুনিয়া স্ত্রীজাতিকে অদ্ভুত ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন, শূদ্রান্ন-ভোজন অতীব দোষনীয় শুনিয়া শূদ্রকে বহুদিন অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন—এই সকল অনুদার প্রক্ষিপ্ত মতগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পুরোহিতগণ অশিক্ষিত দেশবাসীকে এমন ভাবে বুঝাইয়া আসিয়াছেন যাহার ফলে এই সকল অস্পৃশ্য জাতির প্রতি (পুরোহিতের শিক্ষায় সম্মোহিত হইয়া) তথা-কথিত উচ্চবর্ণের যে অমানুষিক অত্যাচার সম্ভব হইয়াছিল, যাহার ইতিহাস পাঠ করিয়া এবং ভারতের নানা প্রদেশের অন্ত্যজজাতির দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া এক মহাপ্রাণ অতি বড় দুঃখে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে হিন্দু !—তুমি তোমার আদর্শ ও অগ্রগমনের ইঙ্গিত দেখিতে পাইবে। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা, এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা লাভ করিবে ? হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়-সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" নিকট বলি প্রদত্ত ; ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ,

দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী; ভারত-বাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'।"—বর্ত্তমান-ভারত।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥

অর্থাৎ—আমাদের দুইজনকে রক্ষা করুন, আমাদের দুইজনকে আহার্য্য দিন, আমাদিগকে বীর্য্যবান করুন, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হউক। আমরা যেন পরস্পর কলহ না করি ॥

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥
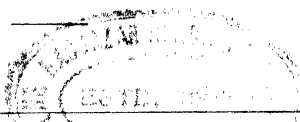
ভ্রমসংশোধন—৩২ পৃষ্ঠার ফুটনোট ৩১ পৃষ্ঠায় হইবে।
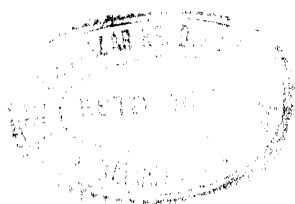
সনাতন ধর্ম্ম—বিবাহ-পদ্ধতি

ভূমিকা

মনুসংহিতা নামে যে মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে উহাতে একা মনুই বক্তা নহেন। মুনি, মহর্ষিগণ, শৌনক, অত্রি, গৌতম এবং ভৃগুও আছেন। তাই মনুসংহিতার বিবাহ-পদ্ধতি তিন স্তরে বিভক্ত রহিয়াছে।

প্রথম স্তর,—এই স্তরে মনু মহারাজের ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম প্রথাতেই বিবাহ প্রচলিত ছিল। তখন সকলেই জানিত গুণ ও কর্ম্ম আশ্রয়ে বর্ণ বিভাগ মাত্র। মূলতঃ সকলেই এক ব্রাহ্মণজাতি হইতে উদ্ভূত—সকলেই ব্রাহ্মণ।

যাহা বেদ বলিয়াছেন, সংহিতায় তাহাই মনু বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং বেদানুগামী সংহিতাই সনাতন ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় স্থল।

দ্বিতীয় স্তর,—এই স্তরে প্রথম অভিযান প্রতিলোম প্রথায় বিবাহের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় অভিযান শূদ্রকন্যা দ্বিজাতির গ্রহণের পক্ষে অযোগ্যা এই অজুহাতে। সুতরাং দ্বিতীয় স্তরে প্রতিলোম প্রথায় বিবাহ রোধ করিয়া এবং অনুলোম প্রথায় শূদ্রকন্যা দ্বিজাতির পক্ষে বিবাহের অযোগ্যা স্থির করিয়া 'বীর্য্য-প্রাধান্য' ঘোষিত হইল। বলা বাহুল্য, এই অভিযানের মধ্যে মনুসংহিতায় ভৃগুর অগ্রে অত্রি, গৌতম, শৌনকের নামও দৃষ্ট হইবে।

তৃতীয় স্তর,—এই স্তরের কর্ত্তা ভৃগু, যিনি নিজ পরিচয়ে মনু-

৬

পুত্র বলিয়াই বেদবিরোধী বিধান সকল উপদেশ করিয়াছেন। মনু সংহিতায় বেদবিরোধী যত আবর্জ্জনা (বিধান) তাহা ভৃগুর। প্রতি অবৈদিক বিধানের সঙ্গে ভৃগুর নাম দৃষ্ট না হইলেও প্রতি অধ্যায়ের শেষে,—'ইতি মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগু-প্রোক্তায়াং সংহিতায়াং অধ্যায়ঃ' দেখিয়া কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, বেদবিরোধী, যতগুলি বিধান মনুসংহিতায় আছে, তাহা মহর্ষি (?) ভৃগুরই দান। তৃতীয় স্তরের প্রথম বিধান রচনা,—স্ববর্ণা কন্যা বিবাহ প্রশস্ত। দ্বিতীয় বিধান হইল,—কোন অবস্থায় স্ত্রী স্বাধীনা নহে (৯।৩)। তৃতীয় বিধানে,—বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ হইল (৯।৬৫)। চতুর্থ বিধানে,—বিধবার স্বামীকে হব্যকব্যে বঞ্চিত করা হইল (৩।১৬৬)। পঞ্চম বিধানে, বিধবার পুত্রকে হব্যকব্যে বাদ দেওয়া হইল (৩।১৮১)। ষষ্ঠ বিধানে,—নিয়োগ প্রথাকে পশুধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করা হইল (৯।৬৬)।

মনু বিধান দিয়াছিলেন,—স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ শিল্পকার্য্য সকলের নিকট হইতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে। (২।২৪০) তাহা 'স্ববর্ণা কন্যা বিবাহ প্রশস্ত' (৩।৪) এই অভিনব ব্যবস্থা দ্বারা মনুর বিধান রোধ করা হইল। স্বয়ম্বর প্রথায় কন্যার যে স্বাধীনতা ছিল (৯।৯০) তাহা 'অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার বিবাহ প্রচলন' (৯।৮৮) ও 'কোন অবস্থায় স্ত্রী স্বাধীনা নহে' (৯।৩), এই দুইটি ব্যবস্থা দ্বারা রোধ করা হইল। বিধবা বিবাহ ও (৯।১৭৫) 'স্ত্রী স্বাধীনা নহে' এবং 'বিধবার বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত নহে' (৯।৬৫) এই ব্যবস্থা দ্বারা নিষিদ্ধ হইল। ইহাও যখন পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হইল না, তখন দ্বিজাতির মধ্যে যে বিধবা বিবাহ করিবে তাহাকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করা

ভৃগু বন্ধ করিলেন। ইহাতেও ভৃগু যে সম্পূর্ণ স্বস্তি অনুভব করিতে পারেন নাই তাহা বিধবার পুত্রকে হব্যকব্যে বাঞ্চত করিবার ব্যবস্থা দেখিলেই সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

মনু তথা বৈদিক-বিধান অচল করিয়া ভৃগু সমাজকে দান করিলেন,—(ক) 'স্ববর্ণা কন্যা বিবাহ প্রশস্ত,' (খ) 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের নামের শেষে,—শর্ম্ম, বর্ম্ম, ভূতি, দাস' এই উপপদ, (গ) 'বীর্য্য-প্রাধান্য।'

এই ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র স্থায়ী পৃথকবর্ণে বিভক্ত হইয়া গেল। ভৃগুর ব্যবস্থা মান্য না করিয়া যাহারা অনুলোম ও প্রতিলোম প্রথায় বিবাহ করিল তাহারা 'বর্ণহীন' ও 'অন্ত্যজ' আখ্যা লাভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ধার্য্য হইল,—শূদ্র দ্বিজাতির কেহ নহে। সে শুধু রহিল দ্বিজাতির সেবা ও অন্ত্যজ জাতির 'বাপ মা'র স্থান অধিকার করিয়া।

অতএব দেখা যাইতেছে,—বেদ তথা মনূক্ত সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই হিন্দুজাতি বহুবর্ণে অন্ত্যজ জাতিতে স্থায়ী ভাবে বিভক্ত হইয়া একতা হারাইয়াছিলেন। ইহারই ফলে, হিন্দুজাতির ভাগ্যে এত দীর্ঘকাল পরাধীনতার তিলক, অশোভন হইলেও, শোভা পাইতেছে।

বর্ত্তমান হিন্দুজাতিকে বাঁচিতে হইলে, সনাতন ধর্ম্ম আশ্রয় করিতেই হইবে। অত্রি, গৌতম, শৌনক ও ভৃগুর ব্যবস্থা মনুসংহিতা হইতে বিদায় করিতে হইবে। তাহা না হইলে, ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে কোন অবস্থাতেই হিন্দুর অগ্রগমন সম্ভবপর নহে। গত বারশত বৎসর হিন্দু সমাজকে বেদবিরোধী ব্যবস্থা দ্বারা অত্রি,

গৌতম, শৌনক ও ভৃগু শাসনে রাখিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দু সমাজের দুর্দ্দশা এত চরমে উঠিয়াছে। মনুর বিধান বা সনাতন ধর্ম্ম বলবৎ থাকিলে, কি স্বাধীন, কি পরাধীন কোন অবস্থাতেই— হিন্দুজাতির বলক্ষয় বা সংখ্যা-হ্রাস হইত না।

আত্ম-বিস্মৃত সুপ্ত হিন্দুজাতিকে জাগ্রত হইয়া—বেদের প্রাধান্য রক্ষায় উৎসাহী দেখিলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

'উদ্বোধন'
১৩৩৫ সাল

অলমিতি—
শ্রীভূমানন্দ—

বিবাহ-পদ্ধতি

"All good things perverted to evil purposes are worse than those which are naturally bad."

প্রথম স্তর

বিবাহ বৈদিক ভারতেও ছিল, বর্ত্তমান ভারতেও আছে। কিন্তু প্রাচীনকালে যত রকম বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, ইদানীং সেই সকল প্রথাই প্রায় লোপ পাইয়াছে। বিবাহ প্রথা বেদেও আছে। বিবাহ প্রথার উল্লেখ মনুসংহিতায়ও আছে। কিন্তু মনুসংহিতা নামক যে স্মৃতিশাস্ত্র বর্ত্তমানকালে আমরা দেখিতে পাই উহাতে একমাত্র মনুই বক্তা নহেন।

বর্ত্তমানকালের মনুসংহিতা বহু ব্যবস্থা দাতা।

'মুনিগণ' 'মহর্ষিগণ' কহিয়াছেন, শৌনক, অত্রি, গৌতম এবং ভৃগুও আছেন। মনুসংহিতায় মনু আছেন বেদানুগামী হইয়া, মুনি মহর্ষিগণ সহ অত্রি, শৌনক, গৌতম এবং ভৃগুনাম-ধারীগণ আছেন বেদ-বিরোধী হইয়া।

মনুসংহিতায় তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ভারতে বেদের পরেই মনুসংহিতার স্থান। সুতরাং সেই সংহিতা এক বিশেষ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রণয়ন করা হইয়াছিল। সে আদর্শ কি তাহা মনুই বলিয়াছেন,—

মনুসংহিতার আদর্শ।

"যে মনুষ্য শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে ইহলোকে সুখ্যাতি ও পরলোকে স্বর্গাদি পরম সুখ লাভ করে।" (মনু-সংহিতা ২য় অধ্যায় ৯ শ্লোক)।

কিন্তু—"ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুগণের ধর্ম্ম নির্ণয়-কল্পে শ্রুতিই প্রকৃষ্ট প্রমাণ—প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ" অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিই প্রামাণ্য॥" (২য় অধ্যায় ১৩)॥ "শ্রুতিদ্বয়ের দ্বিমত হইলে উভয় মতই সম্যক ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য।" (২।১৪)

আদর্শ,—"প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।"

অতএব আমরা মনুসংহিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যেখানে দেখা যাইবে মনুসংহিতায় দ্বিমত রহিয়াছে সেখানে আমরা প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র ঋগ্বেদ হইতে দেখিতে চেষ্টা করিব—শ্রুতিবাক্য—কোন মত সমর্থন করেন।

যে দেশে বেদ, সূত্র, শাস্ত্র রহিয়াছে, সে দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রে কাহার কোথায় স্থান তাহারও নির্দ্দেশ রহিয়াছে। সেই নির্দ্দেশ এই :—

বৃহস্পতি বলেন,—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র বিদ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥
বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতিরপধাস্যতে॥

(প্রয়োগ প্রতিজ্ঞা)

অর্থাৎ যখন বেদ ও স্মৃতির বিধানে বিরোধ উপস্থিত হইবে

তখন শ্রুতিই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তন্নিম্নে স্মৃতির স্থান জানিবে, বেদার্থ বুঝিতে মনুর স্মৃতিই প্রধান, (বেদানুগামী) মনুর স্মৃতির যাহা বিরোধী তেমন বিধান যে স্মৃতি ও পুরাণে আছে তাহা ত্যাগ করিবে।

বিভিন্ন শাস্ত্রের স্থান নির্দ্দেশ।

প্রাচীন যুগে বিবাহে বর ও কন্যার গুণাগুণ দেখিবার প্রথা ছিল। বর্ত্তমান যুগেও গুণাগুণ দেখা হয় বটে —কিন্তু বিবাহ-যোগ্য বয়সের কোন নিয়ম নাই। এই প্রথা সনাতন ধর্ম্ম বিরোধী।—সুতরাং যাহা সনাতন ধর্ম্ম তাহাই বলিতে হইবে। হিন্দুগণ! অবধারণ করুন।

বর কন্যার গুণাগুণ ও বয়স।

মনু বলেন,—ব্রহ্মচারী গুরু গৃহ হইতে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিয়া বিবাহের পূর্ব্বে মধুপর্ক দ্বারা পূজিত হইবে॥ ৩।৩॥

তারপর বিবাহের কথা।

সে বিবাহে বরের গুণের বিচার হইত—তাহার অধ্যয়ন সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে কিনা দেখিয়া। কন্যার গুণের বিচার হইত—সে বিবাহযোগ্যা বয়স লাভ করিয়াছে কিনা,—সে সুশীলা, মনোহারিণী কিনা। প্রাচীন যুগে পিতৃ-পরিচয়ে গৌরব লাভ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না—সকলেই নিজ কর্ম্ম দ্বারা 'স্বনাম-ধন্য-পুরুষ' হওয়া শ্রেয় জানিত। এই জন্য বর বিদ্যাদি-গুণসম্পন্ন না হইলে এমন বরের পক্ষে সুশীলা মনোহারিণী কন্যার পাণিগ্রহণ করা অসম্ভব হইত। কিন্তু বিবাহ-সক্ষম ব্যক্তি যে কোন কুলে বিবাহ করিতে পারিত। এ প্রসঙ্গে মনু বলেন,—স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা,

ধর্ম্ম, শৌচ, হিত-কথা এবং বিবিধ শিল্পকার্য্য সকলের নিকট হইতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে ॥ ২।২৪০ ॥

বিবাহ-বিধায়ক ব্যবস্থা প্রায় সমস্তগুলিই মনুসংহিতার তৃতীয় ও নবম অধ্যায়ে বিধিবদ্ধ দৃষ্ট হইবে।

মনু বলেন,—স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সুবিখ্যাত, পিতা বা গুরু হইতে গৃহীত-বেদ (৩।৩) পুত্রই বিবাহের পক্ষে উপযুক্ত। কন্যার গুণ বিচারে মনু বলেন,—যাহার অঙ্গ বিকল নহে, শ্রুতি-মধুর নাম, হংস বা গজের ন্যায় গমন, রোম, কেশ, দন্ত সুন্দর, কোমলাঙ্গী—এমন কন্যা বিবাহ করিবে ॥ ৩।১০ ॥

তারপর মনু বলিতেছেন,—ইহলোকে ও পরলোকে চতুর্ব্বর্ণের হিত ও অহিতজনক ভার্য্যা প্রাপ্তির—আট প্রকার বিবাহ সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩।২০ ॥

আট প্রকার বিবাহ :—

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহই শাস্ত্র-সম্মত ॥ ৩।২১ ॥

প্রথমোক্ত চারি প্রকার বিবাহে "চতুর্থী কর্ম্ম" সম্ভবপর বলিয়া হিতজনক বুঝিতে হইবে কিন্তু শেষোক্ত চারি প্রকার বিবাহে চতুর্থী কর্ম্ম সম্ভব নয় বলিয়া অহিতজনক জানিতে হইবে। চতুর্থী কর্ম্ম কি, তাহা পরে বলা হইবে।

বিবাহের সংজ্ঞা,—(১) বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা কন্যা ও বরের আচ্ছাদন ও অর্চ্চনা করিয়া বেদপারগ, অযাচক বরকে যে কন্যাদান তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ কহে ॥ ৩।২৭ ॥

১) ব্রাহ্ম

(২) জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ সমারব্ধ কালে হোমাদি কর্ত্তা ঋত্বিককে অলঙ্কৃতা কন্যার যে দান, সেই দান—নিষ্পাপ-বিবাহ, দৈববিবাহ বলিয়া জানিবে ॥ ৩।২৮ ॥

(২) দৈব

(৩) একটি গাভী ও একটি বৃষ বরের নিকট গ্রহণ করিয়া যে কন্যাদান তাহা আর্ষ বিবাহ ॥ ৩।২৯ ॥ আর্ষ বিবাহের লক্ষণ গো-মিথুন গ্রহণ করা।

(৩) আর্ষ

(৪) তোমরা দুইজনে গার্হস্থ্য ধর্ম্মাচরণ কর ইহা বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক কন্যাদান প্রাজাপত্য বিবাহ বলিয়া কথিত ॥ ৩।৩০ ॥

(৪) প্রাজাপত্য

(৫) কন্যার পিত্রাদি বন্ধুদিগকে, অথবা কন্যাকে মূল্যার্থ ধনদান করিয়া উক্ত কন্যা-গ্রহণকে অধর্ম্মহেতু আসুর বিবাহ বলে ॥ ৩।৩১ ॥

(৫) আসুর

(৬) কন্যা ও বরের পরস্পর অনুরাগ বশতঃ যে সংযোগ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। উক্ত বিবাহ মৈথুনের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩।৩২ ॥

(৬) গান্ধর্ব্ব

(৭) বিবাহে কন্যাপক্ষ প্রতিকূল হইলে হত্যাদির দ্বারা কন্যা বলপূর্ব্বক হরণ—রাক্ষস বিবাহ বলে ॥ ৩।৩৩ ॥

(৭) রাক্ষস

(৮) নিদ্রিতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা কন্যাতে অভিগমন করার নাম পৈশাচ বিবাহ। এই বিবাহ সকল বিবাহ অপেক্ষা অধম ॥ ৩।৩৪ ॥

(৮) পৈশাচ

সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট এই আট প্রকার বিবাহ দেখিয়া কেহ কি বলিতে পারেন সংহিতার কোনও বিবাহ-পদ্ধতি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে নিখুঁত ভাবে প্রচলিত আছে? বরং প্রাচীনকালে সমাজে যত প্রকার বিবাহ ছিল ইদানীং তার প্রায় সবগুলি প্রথাই লুপ্ত হইয়াছে।

সংহিতার মতানুযায়ী কোনও বিবাহ-পদ্ধতিই বর্ত্তমানে প্রচলিত নাই।

কিন্তু এই আট রকমের বিবাহ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, কোন যুগেই সমাজ "সুশীল বড় সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহা খায়" এমন শান্তশিষ্ট থাকিতে পারে না। উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রকৃতির লোক লইয়া যখন সমাজ, অথবা সকল রকম মানুষকে যখন সমাজে স্থান দিতে হইবে তখন এক রকম বিবাহ কিছুতে প্রচলিত রাখা চলে না, ইহা বৈদিক ঋষিগণ ও মনুমহারাজ জানিতেন বলিয়াই বহু রকম বিবাহের বিধান দিয়াছিলেন। এই বিবাহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম প্রথাতে প্রচলিত ছিল। প্রমাণ,—(ক) স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলের নিকট হইতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে (মনু ২।২৪০); (খ) স্বয়ম্বর প্রথা আশ্রয়ে। যত দিন এই প্রথাদ্বয় প্রচলিত ছিল ততদিন গোত্রের কোন কথাই উঠে নাই। পাঠক! আপনারা এ কথার সত্যতা 'বংশ পরিচয়ে' দেখিতে পাইবেন। কন্যাদান প্রসঙ্গে গোভিল গৃহ্যসূত্র হইতে 'বিবাহ উৎসব' উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব—সে বিবাহ ও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিবাহে কত প্রভেদ।

বিভিন্ন প্রকৃতি মানুষের জন্য বিভিন্ন রকম বিবাহের ব্যবস্থা

অনুলোম ও প্রতিলোম অনুসারে।

পণ-প্রথা-প্রসঙ্গে দেখা উচিত কন্যাদান করিতে বর বা কন্যার পিতা পণ গ্রহণের দ্বারা একে অন্যের সর্ব্বস্বান্ত করিবেন, ইহার পক্ষে কোন বিধান আছে কি না? আমরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম পণপ্রথা সংহিতাকার সমর্থন করেন নাই। শুল্ক গ্রহণ দোষাবহ, সুতরাং কন্যার পিতা অল্পমাত্রও শুল্ক গ্রহণ করিবেন না। যেহেতু লোভবশতঃ মূল্য গ্রহণ করিলে, তিনি অপত্য বিক্রয় জন্য অতিশয় পাপী হয়েন। (৩।৫১) কোন কোন পণ্ডিতেরা আর্ষ বিবাহে দত্ত গো-মিথুনকে শুল্ক বলেন, মনুর মতে উহা শুল্ক নহে, উহা আর্ষ-বিবাহের অঙ্গ বা লক্ষণ সুতরাং আর্ষ-বিবাহ ভিন্ন কিছু গ্রহণ করিলে বিবাহ অসিদ্ধ হয়। (৩।৫৩) বর্ত্তমান যুগের 'অসিদ্ধ বিবাহে'র সন্তানেরা পৈতৃক সম্পত্তিতে কখন বঞ্চিত হয় না, ইহা কম উদারতার কথা নহে!

সংহিতায় "পণপ্রথা" সমর্থিত নহে।

শুল্কগ্রহণে বিবাহ অসিদ্ধ।

অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন—শুল্ক গ্রহণে কন্যার পিতাকেই ত নিষেধ করা হইল, বরের পিতাকে ত নিষেধ করা হয় নাই? ইহার উত্তর অতি সহজ। আর্য্য জাতি (Aryan race) জগতের যে প্রদেশেই স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করিতেছে, সেইখানেই নারীর সম্মান পুরুষের সম্মান অপেক্ষা অত্যধিক দৃষ্ট হইবে। আর্য্য জাতি যেখানে বীর্য্য প্রকাশ করিয়া স্বাধীনভাবে বিরাজ করিতেছে, সেইখানেই নারীর সম্মান উজ্জ্বলভাবে বিরাজিত। মনু স্বাধীন ভারতের আর্য্যজাতির ব্যবস্থাদাতা ছিলেন। তাই

মনু—স্বাধীন ভারতের ব্যবস্থাদাতা।

তিনি কখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, বরের পিতার কোন দাবী কন্যার পিতার উপর কখনও থাকিতে পারে। মনু কন্যাকুলের সম্মান অব্যাহত রাখিবার জন্য বলিয়াছেন,—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রা ফলাঃ ক্রিয়াঃ।

অর্থাৎ যে কুলে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজিত হয়েন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যে বংশে স্ত্রীদিগের অনাদর হয় সেই বংশে সকল ক্রিয়া (যাগযজ্ঞ, দেব ও পিতৃ-কার্য্য) নিষ্ফল হইয়া যায়॥ ৩ অধ্যায় ৫৬॥ কন্যাকে বরই কেবল বিবাহের সময় ধন দিবেন এমত নহে, বিবাহের পরেও কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পতি, কি দেবর ইহারা সকলেই যদি অতুল কল্যাণরাশি অভিলাষ করেন, কন্যাকে ভোজনাদি দ্বারা পূজা, বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিতা করিবেন॥ ৩।৫৫॥

পাঠক! এই পরাধীন আর্য্যবংশে বহু অনার্য্যমনা দৃষ্ট হইবে, যাহারা স্ত্রীলোককে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা দেখিলে উষ্মা প্রকাশ করে। তাহাদিগের অবগতির জন্য মনুসংহিতা হইতে আরও কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিব।

যে কুলে ভগিনী, পত্নী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা ভূষণাচ্ছাদনাভাবে মলিনা থাকে, সেই কুল শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে কুলে স্ত্রীগণ ভোজন আচ্ছাদনাদি প্রাপ্তিতে উজ্জ্বলা; সে কুল সর্ব্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥৩।৫৮॥ অতএব,—যাঁহারা বিপুল ঐশ্বর্য্যের অভিলাষ করেন তাঁহারা নানাবিধ উৎসবে স্ত্রীদিগকে ভূষণাচ্ছাদনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন॥৩।৫৯॥

যে কুলে ভার্য্যা দ্বারা স্বামী প্রীত ও স্বামী দ্বারা ভার্য্যা সন্তুষ্টা থাকেন, সেই কুলে অবশ্য মঙ্গল হয় ॥৩,৬০॥ উপরোক্ত বিধানগুলি ছাড়া আমরা পাঠকগণকে ৩।৬১ ও ৩।৬২ শ্লোকদ্বয় বিশ্বাস ও ধারণা করিতে এবং অতীতের দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে হিন্দুগণ দেখিতে পাইবেন বৈদিকযুগের সভ্যতা কেমন সহজ—স্বাভাবিক ছিল, যাহা আশ্রয় করিয়া থাকিলে কদাচ বলক্ষয় হইত না। ভৃগুর বিধান —অথবা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য শক্তিক্ষয় করা একই কথা। ভৃগুকে মান্য দিতে যাইয়াই বীর্য্যবান্ হিন্দুজাতি বিবাহ পথে বলক্ষয় ও শক্তিক্ষয় করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং দুর্ব্বল জাতির পক্ষে যাহা স্বাভাবিক হিন্দুজাতিও তাহাই করিতেছে।

ভৃগুকর্তৃক অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয়ে জাতির দুর্ব্বলতা।

রামায়ণে সতীর অবমাননাকারী দশমুণ্ড কুড়িহস্ত রাবণের একলক্ষপুত্র ও সোয়ালক্ষ নাতিসহ নিধনের কথা রহিয়াছে। দ্রৌপদীর অপমানে কুরুবংশ ধ্বংসের কথা মহাভারতে উল্লেখ আছে। তবুও দুর্ব্বল হিন্দুজাতি,—"রমণী বধিছে পিশাচ হয়ে!"

বিবাহ উৎসবে—আচারাদি

বিবাহাচারাদি মনুতে নাই। সুতরাং গোভিল গৃহ্য-সূত্র দ্রষ্টব্য।

মনুসংহিতায় বিবাহ প্রকরণ রহিয়াছে কিন্তু কি আচারে সেই বিবাহ সম্পন্ন হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই। সেজন্য আমরা গোভিল-গৃহ্যসূত্র হইতে কি প্রণালীতে বৈদিকযুগে বিবাহ সম্পন্ন

হইত তাহার চিত্র দিলাম। ভগবান্ গোভিল সামবেদীয়-গৃহ্যসূত্র-প্রণেতা, সুতরাং তাহা বেদের ন্যায় প্রামান্যই জানিতে হইবে।

গোভিল-গৃহ্যসূত্র।

দ্বিতীয় প্রপাঠক—প্রথম খণ্ড

বিবাহ

পাণিগ্রহণ করিতে হইলেও বাড়ীর মধ্যে অগ্নিস্থাপন করিতে হইবে॥ ১২॥ তারপর কন্যার একজন আত্মীয় বস্ত্রাচ্ছাদিত ও সংযতবাক্ হইয়া যে পুষ্করিণীর জল কখন শুকাইয়া যায় না এমন জলাশয় হইতে এক কলসী জল আনিয়া অগ্নিকে সম্মুখে রাখিয়া প্রদক্ষিণ-ক্রমে অগ্নির দক্ষিণে উত্তরাভিমুখে অবস্থিতি করিবে। আর এক-জন ঐরূপে পাঁচনী হাতে লইয়া থাকিবে। অগ্নির পশ্চাতে শমীপত্র মিশ্রিত চার অঞ্জলি পরিমাণ খৈ রাখিতে হইবে এবং একটি নোড়াও তথায় রাখিতে হইবে॥ ১৩—১৬॥

বৈদিক বিবাহ-বিধি।

অনন্তর বর যে কন্যাকে বিবাহ করিবে, তাহাকে মস্তক পর্য্যন্ত ভিজাইয়া স্নান করাইয়া দিবে। বিবাহ দিবসে ইহাই হইল কন্যা স্নান॥ ১৭॥

স্নানের পরে বর মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কন্যাকে অখণ্ডবাস পরিধান করাইবে। ইহাই হইল কন্যাবাস পরিধান॥ ১৮॥

কন্যাবাস পরিধান হইলে কন্যাকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়া বর কন্যাকে নিকটে আনিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে এবং অগ্নির পশ্চাতে

স্থাপিত কট বা ঐরূপ অপর কোন আসন কন্যার পাদ দ্বারা চালাইয়া অগ্নির সমীপে অস্তৃতবর্হি পর্য্যন্ত আনাইবে। তখন কন্যাকে মন্ত্রপাঠ করাইবে। কন্যা মন্ত্রপাঠ করিতে না পারিলে বর স্বয়ং সেই মন্ত্রপাঠ করিবে॥ ১৯—২১॥

সেই পদচালিত আসনে বরের বামদিকে কন্যা উপবেশন করিবে। কন্যা স্বীয় দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বরের দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিয়া থাকিবে। তখন বর, কন্যা গ্রহণ কামনায় কল্যাণসূচক ছয়টি মন্ত্রপাঠ করিয়া, অগ্নিতে ছয়বার আহুতি প্রদান করিবে। পরে তিনটি মন্ত্র পড়িয়া পৃথক পৃথক তিনটি হোম করিবে এবং ঐ তিনটি মন্ত্র একত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ হোম সম্পন্ন করিবে॥২৩—২৬॥

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ হোমের পরে বরের বাম হস্ত কন্যার পৃষ্ঠ হইয়া বাম স্কন্ধে এবং কন্যার দক্ষিণ হস্ত বরের পৃষ্ঠ হইয়া দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিয়া উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইবে॥ ১॥

বর, কন্যার পশ্চাৎ দিক দিয়া গমন করিয়া তদীয় অঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক উত্তর মুখে অবস্থান করিবে॥ ২॥

মাতা অথবা ভ্রাতা শিলের উপরে খৈ রক্ষা করিয়া কন্যার পাদ দ্বারা নোড়া চালাইয়া খৈ চূর্ণ করাইবে॥ ৩॥

এই সময় বর মন্ত্রপাঠ করিতে থাকিবে॥ ৪॥

কন্যার ভ্রাতা মাত্র একবার এক অঞ্জলি খৈ লইয়া স্বীয় ভগিনীর অঞ্জলিতে প্রদান করিবে॥ ৫॥

কন্যা সেই অঞ্জলি খৈ পূর্ব্বের ন্যায় পাদ দ্বারা শিল নোড়ায়

পিষিয়া সাবধানে অঞ্জলি করিয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবে ॥ ৬ ॥

কিন্তু এই হোমদ্বয়ের পূর্ব্বে মন্ত্র পঠিত হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে অন্য মন্ত্রদ্বয় যথাক্রমে প্রযুক্ত হইবে ॥ ৭ ॥

আহুতি প্রদান করিবার পরে বর কন্যাকে অগ্র করিয়া যেমন পূর্ব্বে গমন করিয়াছিল তেমন ভাবে পুনরাগত হইবে। এবং অপর কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কন্যাকে বরের সহিত পরিণীত করিবে অর্থাৎ কন্যা যে পতিলোক প্রাপ্ত হইল তাহা উভয়কে বুঝাইয়া দিবে ॥ ৮ ॥

কন্যার বিবাহ মন্ত্র পাঠ হইবার পরে সেই প্রকার শিল নোড়া দ্বারা খৈ পেষণ (অশ্মাক্রামণ) করাইবে, সেই সেই মন্ত্র পাঠ হইবে—পূর্ব্বের ন্যায় মন্ত্র পাঠ করিয়া যে খৈ কন্যার হাতে দেওয়া হইবে—মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই খৈএর হোম হইবে ॥ ৯ ॥

এইরূপে তিনবার খৈ আহুতি হইবে। ইহাকেই পরিণয় কহে ॥১০॥

তিনবার আহুতির পরে যে খৈ অবশিষ্ট থাকিবে তাহা মন্ত্র না পাঠ করিয়া অগ্নিতে অর্পণ করিয়া ঈশান কোণে একটি মন্ত্র পাঠ করাইয়া বধূকে সপ্ত পদ গমন করাইবে ॥১১॥

বধূকে সপ্ত পদ গমন করাইবার সময় দক্ষিণ পদ অগ্রে বাড়াইতে হইবে। কদাচ বামপদ অগ্রে বাড়াইবে না ॥১২॥

গমনের সময় একটি মন্ত্র পাঠ করিবে ॥১৩॥

ইহার পরে বধূ-আশীর্ব্বাদ হইবে। সমবেত দর্শকগণ মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক নববধূকে আশীর্ব্বাদ করিবে ॥১৪॥

অনন্তর এক জলবাহী অগ্নির পশ্চিমে আসিয়া পাণি-গ্রহণে উদ্যত বর ও বধূর মস্তকে জল ঢালিয়া স্নান করাইয়া দিবে তখন বর ও বধূ এক সঙ্গে একটি মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ১৫ ॥

বর, জলসিক্ত বধূর অঞ্জলি (দুইহাত একত্রে) বাম হস্তে গ্রহণ করতঃ দক্ষিণ হস্তদ্বারা কন্যার দক্ষিণ হাতের মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ধরিয়া পাণিগ্রহণ বাচক মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ইহাই পাণি-গ্রহণ ॥ ১৬ ॥

পাণি গ্রহণান্তর সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্ম সমাধা হইবার পরে সেই বধূকে স্বজনেরা রথে করিয়া বহন করাইবে অর্থাৎ শ্বশুরালয়ে (পতিলোক) যাত্রা করিবে ॥ ১৭ ॥

তৃতীয় খণ্ড

বিবাহের উৎসবে প্রথমে পরিণয় ক্রিয়া পরে পাণি গ্রহণ কর্ম্ম সামাধা হইলে "উত্তর বিবাহ" সম্পাদন করিবার যে রীতি ছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

উত্তর বিবাহ।

যদি পতিলোক দূরে থাকে—তাহা হইলে সমীপস্থ ঈশান কোণে অবস্থিত এক ব্রাহ্মণের গৃহে 'উত্তর বিবাহ' সম্পাদনের জন্য যথা বিধি অগ্নি স্থাপন করিবে ॥ ১ ॥

সেই স্থাপিত অগ্নির পশ্চাৎ ভাগে লোহিতবর্ণ গো-চর্ম্ম এক-খানা, লোমপৃষ্ঠ উপরিভাগে রাখিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বা করিয়া বিছাইবে। চর্ম্মের শিরোদেশ পূর্ব্বদিকে সুতরাং অধোদেশ পশ্চিম দিকে রক্ষা করিতে হইবে ॥ ২ ॥

সেই গো-চর্ম্মাসনে বধূকে মন্ত্রপাঠ করাইয়া বসিতে দিবে ॥ ৩ ॥

সেই বধূ নক্ষত্রোদয় কাল পর্য্যন্ত সেই আসনে বসিয়া থাকিবে ॥৪॥

বিজ্ঞগণ নক্ষত্র উদয় হইয়াছে বলিবার পরে ছয়টি মন্ত্র পাঠ করিয়া ছয়বার আজ্যাহুতি দিতে হইবে ॥৫॥

সেই ছয়টি আহুতির প্রত্যেকবারের শেষ ঘৃতধারা সেই বধূর মস্তকে প্রদান করিবে ॥৬॥

এই ছয় আহুতি শেষ হইলে বর ও বধূ উভয়ে একত্রে আসন ছাড়িয়া উঠিবে এবং বর বধূকে ধ্রুব নক্ষত্র দেখাইবে ॥৭॥

নক্ষত্র দর্শন সময়ে বধূ এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—

"হে নক্ষত্র! তুমি স্থির প্রকৃতি, এই জন্য ধ্রুবনামে খ্যাত, আমি যেন পতিকুলে স্থির প্রকৃতি হই।" আমি অমুক নাম্নী, অমুক নাম ব্যক্তির পত্নী এই মন্ত্র বধূ পাঠ করিবে। এই মন্ত্রের মধ্যগত অমুক পদের স্থানে পতির নাম এবং অমুক নাম্নীর স্থানে কন্যা স্বীয় নাম গ্রহণ করিবে ॥ ৮ ॥

সেই সময়ে পতি, বধূকে অরুন্ধতী নামক নক্ষত্রটি দর্শন করাইবে ॥ ৯ ॥

এই অরুন্ধতী দর্শনকালে বধূ বলিবে—অমুক নাম্নী আমি, অমুক নাম পতির আদেশ-বদ্ধা হইতেছি ॥ ১০ ॥

তদনন্তর পতি মন্ত্র পাঠ করত বধূকে অনুমন্ত্রণ করিবে ॥ ১১ ॥

অনুমন্ত্রিতা ঐ বধূ, অমুক গোত্রা অমুক নাম্নী আমি তোমাকে অভিবাদন করিতেছি বলিয়া পতির পাদগ্রহণ-পূর্ব্বক প্রণাম করিবে ॥ ১২ ॥

এই পর্য্যন্ত বধূ নিয়মিতবাক্ থাকিয়া অতঃপর সে নিয়ম ত্যাগ করিবে অর্থাৎ এখন হইতে বধূ কথাবার্ত্তা বলিতে পারিবে ॥ ১৩ ॥

যে দিবস প্রথম বিবাহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, সে দিন লইয়া তিন দিন বর ও বধূ উভয়ে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে অর্থাৎ ক্ষারলবণ খাইবে না, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে "চতুর্থী কর্ম্ম" না হওয়া পর্য্যন্ত উভয়ে পৃথক শয্যায় ভূমিতে শয়ন করিবে ॥ ১৪ ॥

(চতুর্থ দিনে চতুর্থী কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিবে।)

এই তিন দিবসের মধ্যে যে কোন দিন, যে কোন সময়ে, কন্যাকর্ত্তা, স্বীয় অবসর ক্রমে বরকে মধুপর্কাদি দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১৫ ॥

কিন্তু নব্যগণ বলেন, যাঁহাদিগকে পূজা করিতে হইবে তাঁহারা আগত হইবামাত্র তৎক্ষণেই কর্ত্তব্য। ইহাকেই অর্ঘ্যদান কহে ॥ ১৬ ॥

প্রথম দিন অর্ঘ্যাস্বাদনে তৃপ্ত হইবে। দ্বিতীয় দিন বধূর অরুন্ধতী দর্শন-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবে; বিশেষত পথিমধ্যে পরগৃহে ব্যস্ততার মধ্যে রান্নার আয়োজন হওয়াও সুকঠিন। যদি হয় ত সেই দিনেই, অন্যথা পরের দিন সকাল হইতে আপনাদের রান্না প্রস্তুত করিবে। পাক প্রস্তুত কালে অগ্নি, প্রজাপতি, বিশ্বদেবা ও অনুমতি দেবতা যথাক্রমে আরাধনা করিবে। পাক-প্রস্তুত হইলে নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট অন্ন অন্যপাত্রে ঢালিয়া মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া অভ্যুক্ষিত করিবে। তারপর বর ভোজন

করিয়া, অবশিষ্ট ঐ অন্ন বধূকে প্রদান করিবে। পরে যথেচ্ছা বিচরণাদি করিবে ॥ ১৭—২১ ॥

এই কন্যাগ্রহণ কার্য্যের দক্ষিণা একটি গাভী ॥ ২২ ॥

ইহাই হইল বৈদিক মতের, সনাতন বিবাহ-পদ্ধতি।

গোভিল গৃহ্যসূত্রে "নব্যগণ বলেন" বলিয়া ১৬—২১ পর্য্যন্ত সূত্রগুলি গ্রহণের অযোগ্য। কোন সূত্রকারের সহিত প্রাচীন বা নব্যমতের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। যাহা নিত্য, সত্য সুতরাং সনাতন তাহাই ঋষিগণ বলিয়াছেন। সুতরাং যাহা গোভিল বলিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে—'নব্যগণ বলেন' বলিয়া পরে যাহা যুক্ত হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে ইহাই আমাদের অভিমত।

উক্ত সূত্রে নব্যগণের উদ্ধৃত মত গ্রহণযোগ্য নহে।

যে কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে এত কথার আলোচনা—সেই কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধে সংহিতা কি বলেন তাহাও সকলের জানিয়া রাখা বিধেয়।

বৈদিক বিবাহের পদ্ধতি দেখিয়া বোধ হয় কাহারও মনে জাগিবে না বিবাহ যোগ্যা কন্যা,—একটি নোলকপরা খুকী মাত্র। বরং কন্যা যে ষোড়শীর ন্যায় তাহা গোভিল গৃহ্য সূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সূত্র পড়িলে অনেকেরই বিশ্বাস হইবে। চতুর্থ হোমের পরে বরের বামহস্ত কন্যার পৃষ্ঠ হইয়া বাম স্কন্ধে এবং কন্যার দক্ষিণ হস্ত বরের পৃষ্ঠ হইয়া দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিয়া উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইবে এই ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে গেলে—

কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স গোভিলের মতে।

ত্রিশ বৎসরের পুরুষের যোড়শী কন্যা বিবাহ করা সমীচীনই বলিয়া মনে হইবে যাহা মহাভারত-কারও স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু মনু মহারাজকে মনুসংহিতার মধ্যে অচল করিবার জন্য ভৃগু মনূক্ত বিবাহে কন্যার বয়স নিরূপণের অগ্রে, পার্শ্বে এবং পরে যে বিরুদ্ধ ভাবের শ্লোক সৃজন করিয়াছেন তাহাতে দৃষ্ট হইবে,—ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। * * * বরের বয়সের এক তৃতীয়াংশ বয়স কন্যার হইবে অন্যথায় ধর্ম্মহানি হইবে॥ ৯।৯৪॥

বর্ত্তমানে মনু-সংহিতায় ভৃগুমত।

কিন্তু সীতা, সাবিত্রী, কুন্তী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী ও সুভদ্রা প্রভৃতির বিবাহ-যোগ্য বয়স দেখিয়া মনে হয় না, কন্যার বয়স বরের এক তৃতীয়াংশ ছিল—এবং ঐ সকল বিবাহে ধর্ম্মহানি ঘটিয়াছিল।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে কন্যার বিবাহ-যোগ্য বয়স সম্বন্ধে প্রচলিত নিয়ম যে কি, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং যাহা মনুমহারাজ বলিতেছেন, তাহা পাঠ করিয়া হয়ত অনেকেই অস্বস্তি বোধ করিবেন।

সংহিতায় আছে,—

> কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
> ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ ৯।৮৯॥

অর্থাৎ ঋতুমতী হইয়াও কন্যা যাবজ্জীবন পিতৃগৃহে থাকিবে, সেও বরং ভাল, তথাপি কন্যা বিদ্যাদি গুণরহিত পুরুষকে কদাচ দান করিবে না। বেদজ্ঞ ভাষ্যকার আচার্য্য মেধাতিথি এই

শ্লোকের ভাষ্যে বলেন,—প্রাগৃতোঃ কন্যায়া ন দানম্, ঋতুদর্শনেঽপি ন দদ্যাদ্যাবদ্ গুণবান্ বরঃ ন প্রাপ্তঃ। গুণো বিদ্যাশৌর্য্যাতিশয়ঃ শোভনাকৃতির্বয়োমহত্ত্বোপেততা লোক-শাস্ত্র-নিষিদ্ধ-পরিবর্জনং কন্যায়ামনুরাগ ইত্যাদিঃ॥ অর্থাৎ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে কন্যাকে দান করিবে না, ঋতুমতী হইলেও যতদিন না গুণবান্ বর পাওয়া যায়, ততদিন কন্যাদান করিবে না। গুণের অর্থ—বিদ্যা শৌর্য্যাতিশয়, সুন্দরাকৃতি ও বয়স, মহত্ত্ব-সম্পন্নতা, লোকশাস্ত্র নিষিদ্ধ পরিবর্জন এবং কন্যার প্রতি অনুরাগ ইত্যাদি। অতএব জানিতে হইবে কন্যার বিবাহ যোগ্য বয়সের সনাতন নিয়ম হইয়াছে—'প্রাগৃতোঃ কন্যায়া ন দানম্'।

বিবাহে কন্যার বয়সনিরূপণ

পূর্ব্বে যে মনূক্ত আট রকম বিবাহের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও স্বয়ম্বর প্রথায় বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ মনু সমর্থন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা প্রথমে ঋগ্বেদের মন্ত্রানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাতে মনুর বিধান উদ্ধার করিব। যথা,—কত স্ত্রীলোক আছে, যাহারা কেবল অর্থে প্রীত হইয়া নারী সহবাসে অভিলাষী মানুষের প্রতি অনুরক্ত হয়। যে স্ত্রী সুশীলা, যাহার শরীর সুগঠিত, সেই অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয়পাত্রকে বরণ করে॥ ঋ-সং ১০ মণ্ডল, ২৭ সূক্ত, ১২ ঋক॥ মনুসংহিতায় স্বয়ম্বর প্রথা সমর্থিত হইয়াছে এই ভাবে যথা,—পিত্রাদিরা যদি গুণবান্ বরকে

ঋগ্বেদে স্বয়ম্বর প্রথা।

মনু সংহিতায় স্বয়ম্বর প্রথা।

কন্যা সম্প্রদান না করে, তবে কন্যা ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে পরে স্বয়ম্বরা হইবে ॥ ৯।৯০ ॥

স্বয়ম্বর প্রথার উদাহরণ।

স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে সাবিত্রীর উপাখ্যান ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা অনেকেরই মনে পড়িবে। হিন্দুসূর্য্য পৃথ্বী-রাজের মূর্ত্তির গলায় সংযুক্তার মাল্যদান—ইতিহাস প্রসিদ্ধ কথা। আমরা বংশ পরিচয় অর্থাৎ কুলুজি ধরিয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছি,—স্বগোত্রে বিবাহ প্রথা প্রশংসনীয় ছিল। কিম্বা যে কুল হইতে ইচ্ছা কন্যা গ্রহণ করা চলিত। (১)

বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য্য পালন অসম্ভব বিধান।

বৈদিকযুগে বিধবা-বিবাহ ত ছিলই—নিয়োগ প্রথাও ছিল। তখন আজীবন কুমারীও থাকিত। বর্ত্তমান মনুসংহিতার দোহাই দিয়া একালে যেমন বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য্য একমাত্র বিধবার জন্য রক্ষিত হইয়াছে—এমন অসম্ভব বিধান জীবতত্ত্বে অভিজ্ঞ বৈদিক ঋষিগণ কখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই। বিধবা-বিবাহ ভাল কি মন্দ তাহা যাহার ইচ্ছা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন, কিন্তু যে

বিধবা-বিবাহ—ঋগ্বেদ।

জাতি শাস্ত্রের আদেশে চালিত সেই জাতির বিধবা সম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলেন, "হে নারী, সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট

---

(১) স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥ মনু ২।২৪০ ॥

অর্থাৎ স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ শিল্পকার্য্য সকলের নিকট হইতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে।

শয়ন করিতে যাইতেছ সে গত হইয়াছে। চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া তোমার গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল সকলই তোমার করা হইয়াছে॥" (১০ মণ্ডল, ১৮ সূক্ত, ৮ ঋক)॥ পাঠক! আপনারা যে পবিত্র সতীদাহ প্রথা শুনিয়াছেন এই ঋক পড়িলে সেই চিত্র আপনাদের মনে উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। শ্মশানে স্বামীর শরীর অগ্নিতে অর্পন করা হইয়াছে স্ত্রী অদূরে ভূমিতে লুটাইতেছে— কিন্তু কেহ তাহাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উৎসাহ দিল না বরং বলিয়া উঠিল,—'যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য সকলই তোমার করা হইয়াছে; সুতরাং, হে নারী, সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ সে গত হইয়াছে' অতএব 'চলিয়া এস'। এই ঋক মন্ত্রের পূর্ব্ব-মন্ত্রটি বিধবা-বিবাহের সপক্ষে অধিক পরিস্ফুট। যথা :—"এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতিলাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন॥ (১০ মণ্ডল, ১৮সূক্ত, ৭ঋক)॥

মনুমহারাজ সংহিতায় বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন— বিধবার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া; যথা,—

"যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া.
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥" ৯ অধ্যায় ১৭৫॥

অর্থাৎ পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃতপতিকা (বিধবা) যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া স্বামী সহায়ে পুত্র উৎপাদন করে সেই পুত্র, উৎপাদকের পৌনর্ভব-পুত্র হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শুধু বিধবারই ইচ্ছা হইলে যে বিবাহ হইতে পারিত এমত নহে, স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীরও পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার অধিকার ছিল।

শুধু বিধবা নহে—পতি-পরিত্যক্তাও পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কি উপায়ে এদেশে "সতীদাহ" প্রচলিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। বেদে বিধবা বিবাহের উল্লেখ আছে কিন্তু সতীদাহ প্রথার কোন উল্লেখ নাই। বৈদিক ঋষিগণের মহান্ হৃদয় যেমন করুণা ও সমবেদনায় পূর্ণ ছিল তাঁহাদের ব্যবস্থাও তেমনই উদার ছিল। কিন্তু তখনও ঋষিগণ জানিতেন না যে, বিধবা-বিবাহের মন্ত্রটিকেই একটু পরিবর্ত্তন করিয়া কি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড পরবর্ত্তী যুগে অনুসৃত হইবে। জানিলে এমন মন্ত্র তাহারা রক্ষা করিতেন কিনা কে বলিবে! মন্ত্রে আছে :—

বেদে সতীদাহ নাই।

ঋষিগণের ব্যবস্থা উদার।

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাং জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ যুবত্না আ রোহংতু জনয়ো যোনিমগ্রে॥

(১০ মণ্ডল, ১৮ সূক্ত, ৭ ঋক ॥)

পাঠক! আপনারা যে পবিত্র সতীদাহ প্রথা শুনিয়াছেন, তাহার উদ্ভব হইয়াছিল যে মন্ত্রে, বেদ বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিতেছেন সেই ঋককে পরিবর্ত্তন করিয়া। ইহাই শাস্ত্ররক্ষক

সদাচার-ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্ব বলিতে হইবে। ১০ মণ্ডল, ১৮ সূক্ত, ৭ ঋকে যে মন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি পাঠক দেখিবেন তাহার শেষের দিকে "যোনিম্ অগ্রে" রহিয়াছে। এই "অগ্রে" শব্দটিকে "অগ্নে" করিয়া যে মন্ত্রে বিধবাকে বিবাহের অধিকার দিয়াছিল ঠিক সেই ঋকের দোহাই দিয়া সতীদাহ চালান হইয়াছিল। সে কালের 'শাস্ত্রজ্ঞগণ' সকলেই গত হইয়াছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে বলা আর না বলা এখন উভয়ই সমান। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষকগণও ব্রহ্মচর্য্যের 'আদর্শ' রক্ষায় খুবই তৎপর আছেন। তবে সে তৎপরতা ষোল আনার উপর আঠার আনা বিধবার বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য্যের জন্যই দৃষ্ট হইবে কিন্তু পুরুষের জন্য বানপ্রস্থ গ্রহণ করিবার কথা যে মনু বলিয়াছেন শাস্ত্ররক্ষকগণ তাহা মোটেই পালন করেন না। বিধবার পক্ষে না বুঝিয়া মন্ত্রজপ, উপবাস এবং পূজা অর্চ্চনার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাই যদি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয়—তবে অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইবে, মনুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া—পরবর্ত্তী যুগে যাহারা স্ত্রী চরিত্র না বুঝিয়া চিরব্রহ্মচারিণী থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই সেই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে আজ ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব —আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা। কেন এমন হইল বলিলেও সদাচার-সম্পন্ন শাস্ত্ররক্ষকগণ বুঝিবেন না জানি; কিন্তু দেশবাসী একটু স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিবেন কি—এত "জানায়-মানায় না কেন ?"

বেদমন্ত্রাক্ষর পরিবর্ত্তনে বিধবাবিবাহ পরিবর্ত্তন করিয়া সতী-দাহ প্রচলন।

বর্ত্তমানে ব্রহ্মচর্য্যাচরণ জন্য নারী-জাতির উপর ভার— ও পুরুষেরা খালাস।

বিধবা বিবাহ ভাল কি মন্দ তাহাতে মতদ্বৈধ হওয়া কিছু দোষের নহে, কিন্তু 'অগ্রে'কে 'অগ্নে' করায় এদেশে সতীদাহের জন্য যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যাহা বলিয়াছেন তাহাও আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

ম্যাক্সমুলার।

Prof. Maxmuller writes,—

This is perhaps the most flagrant instance of what can be done by an unscrupulous priesthood. Here have thousands and thousands of lives been sacrificed, and a fanatical rebellion being threatened on the authority of passage which was mangled, mistranslated and misapplied (Selected Essay Vol. I, Page 335, 1881 A.D.).

অর্থাৎ অধ্যাপক বলেন,—"বিচারহীন মতলববাজ পুরোহিতবর্গ কতদূর অনর্থ করিতে পারে ইহাই সম্ভবতঃ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই মন্ত্রটিকে বিকৃত করিয়া হাজার হাজার প্রাণ বলি দেওয়া হইয়াছে। ইহার জন্য আবার সাধারণকে কুসংস্কারপূর্ণ বেদ-বিদ্রোহিতার ভয় দেখান হইয়াছিল। ভ্রমপূর্ণ প্রয়োগ এবং অনুবাদ করিতে যাইয়া মন্ত্রটিকে এইরূপে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করা হইয়াছে।"

সতীদাহ বিচারহীন মতলব-বাজ পুরোহিত বর্গের দ্বারা মন্ত্রবিকৃতির প্রমাণ ও ফল।

উক্ত অধ্যাপক একাই প্রতিবাদ করেন নাই; রাজা রামমোহন

রায়, স্বামী দয়ানন্দ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বাধ্যতামূলক বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আর ইঁহারা সকলেই প্রচলিত কথায় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অতি দুঃখে গাহিয়াছিলেন,—**

"হয়ে আর্য্য বংশ— অবনীর সার,
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে॥"

নিয়োগ-প্রথা—বেদ

হিন্দুগণ! আপনারা এ পর্য্যন্ত বেদে স্বয়ম্বর-প্রথা, বিধবা-বিবাহ যাহা মনুমহারাজ সংহিতায় সমর্থন করিয়াছেন তাহা দেখিলেন। এখন দেখুন নিয়োগ-প্রথা বা দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি সম্বন্ধে বেদ কি বলেন, "অশ্বিন্! যেমন বিধবা স্ত্রীলোক আপন শয্যায় দেবরকে আকর্ষণ করে, যেমন নারী নরকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ তোমাদিগকে কে আকর্ষণ করিয়া থাকে?" ঋগ্বেদ (১০ মণ্ডল, ৪০ সূক্ত, ২ ঋক)॥

মনুসংহিতায় মনুমহারাজও নিয়োগ-প্রথা সমর্থন করিয়াছেন। যথা,—"যে কন্যার বিবাহার্থ বাগ্‌দান হইয়াছে সেই কন্যার ভাবী পতির মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী বিধানানুসারে দেবর উক্ত কন্যাকে গ্রহণ করিবে॥" ৯।৬৯॥

সংহিতায় নিয়োগ-প্রথা।

"উক্ত দেবর কন্যাকে বিবাহোক্ত বিধানে স্বীকার করিয়া প্রতি ঋতু সময়ে সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত গমন করিবে। সন্তান মৃত স্বামীর বংশধর হইবে॥" ৯।৭০॥

"সন্তানের অভাবে (স্বামী বর্ত্তমানে) স্ত্রী, পতি প্রভৃতি

গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত দেবর অথবা যে কোন সপিণ্ড হইতে অভিলাষিত সন্তান লাভ করিবে॥" ৯।৫৯॥

"বিধবাতে অথবা অক্ষম পতিসত্বে সধবাতেও নিযুক্ত দেবর বা কোন সপিণ্ড ঘৃতাক্ত শরীরে মৌনাবলম্বনে একটি পুত্র উৎপন্ন করিবে, দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করিবে না॥" ৯।৬০॥

উপরোক্ত শ্লোকে নিয়োগ স্বীকৃত হইলেও উহাকে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে দেখিয়া মনে হইবে ঐ ব্যবস্থা কোন অপরিপক্ক হস্তের লিখিত তাই পরের শ্লোকেই দেখিতেছি,—"কোন কোন আচার্য্য কহিয়াছেন, একপুত্র অপুত্রের মধ্যে গণ্য এইজন্য ঐরূপ দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করিবে॥" ৯।৬১॥ বৈদিক ঋষিগণ এবং মনুমহারাজ জানিতেন স্ত্রী-হৃদয়ে সন্তানের জননী হওয়া অপেক্ষায় কাম্যবস্তু আর কিছুই নাই। আজ আমরা নিয়োগ প্রথা যত জঘন্যই ভাবিতে শিখি না কেন প্রাচীন ভারতে এই নিয়োগ প্রথাতে কুরুবংশ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ বংশ রক্ষা হইয়াছিল। নিয়োগ প্রথাতে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম হইয়াছিল, পাণ্ডবগণের জন্ম নিয়োগ প্রথায় হইয়াছিল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুহ্ম, পুণ্ড্র ওড্র নামা বলির পুত্রগণ উদ্ভব হইয়াছিল। মহাভারত, ইতিহাস, পুরাণগুলি ভাল করিয়া পড়িলে সকলেই অনেক কিছু নূতন দেখিতে পাইবেন। যাহা এক কথায় বলিতে গেলে,—

মহাভারত, পুরাণাদিতে নিয়োগ প্রথা।

'বড় ঘরের বিধবার জন্যই নিয়োগ-প্রথা এবং গরীবের ঘরের বিধবার জন্য বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিতে হইবে। সমস্ত মহাভারতে বড় ঘরের

মহাভারতে বিধবা-বিবাহ।

বিধবা কন্যা উলুপী ছাড়া অপর কাহার নাম দৃষ্ট হয় না যিনি পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন ; এই বিধবা উলুপীই উত্তরকালে অর্জ্জুনের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। সগোত্রে বিবাহ এবং নিয়োগ-প্রথায় রাজ্য রক্ষা করিবার কাহিনী সাধারণকে অবগত করাইবার জন্য নিম্নে মহাভারত ও ভাগবত মিলাইয়া বংশ পরিচয় দেওয়া গেল। যে কেহ বংশ পরিচয় পাঠ করিলেই আমাদের কথার সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

চন্দ্রবংশ

(ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ হইতে বংশাবলী গৃহীত)

সহস্রশীর্ষা পরমপুরুষ ভগবান্

তৎ নাভি পদ্ম হইতে

|

ব্রহ্মা

তাঁহার নেত্র হইতে

|

অমৃত-ময় সোম

(ব্রহ্মা ইহাকে বিপ্র, ঔষধি ও নক্ষত্র সকলের আধিপত্য দিয়াছিলেন)

চন্দ্র বংশ
(ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ হইতে বংশাবলী গৃহীত)
পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পরে
পুরুরবা
আয়ু
সত্যায়ু
শ্রুতায়ু
রয়
বিজয়
ইহা হইতে ১১শ
গাধি
বিশ্বামিত্র
ইঁহার বংশধরগণ
ব্রাহ্মণ।
ইনি ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ
অজীগর্ত্ত-তনয় শুনঃ-
শেফকে দত্তক গ্রহণ
করিয়াছিলেন।
জয়
নহুষ
পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
ক্ষত্রবৃদ্ধ
(কাশীরাজ বংশ)
রজি
রাভ
অনেনা
সুহোত্র
কাশ্য
ইঁহা হইতে পঞ্চম
ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ-
প্রবর্ত্তক যজ্ঞ-ভাগ-
ভোগী ইত্যাদি।
কুশ
গৃৎসমদ
শুনক
শৌনক (বহ্বৃচশ্রেষ্ঠ)

(যযাতি ভৃগু-বংশীয়া শুক্রাচার্য্য-কন্যা দেবযানীকে প্রতিলোম-ক্রমে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করেন।)
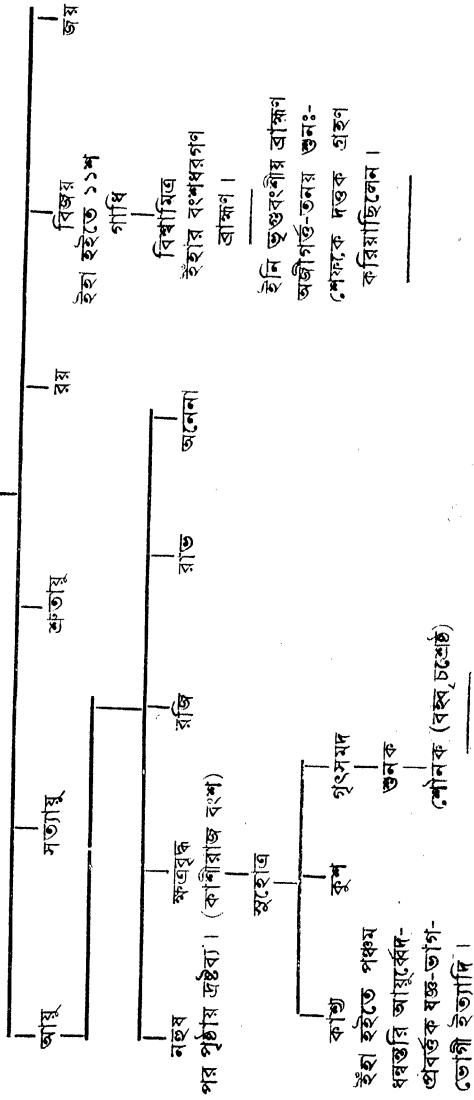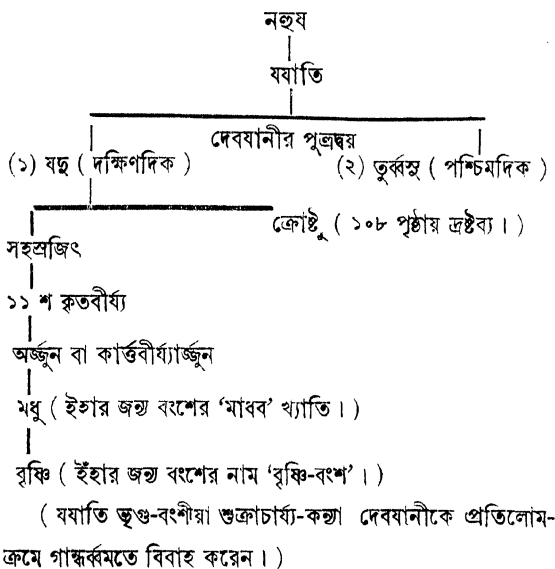
এই বংশ-তালিকায় কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে,—

(ক) স্বগোত্রে বিবাহ।

(খ) কাহার নামের শেষে কোন উপপদ অর্থাৎ শর্ম্ম, বর্ম্ম, ভূতি, দাস যুক্ত নাই।

(গ) গুণানুসারে কর্ম্ম করিতে যাইয়া পৃথক বর্ণ-প্রাপ্তি।

(ঘ) ক্ষেত্রজ পুত্রগণের পরিচয়।

(ঙ) অনুলোম ও প্রতিলোম প্রথায় বিবাহ।
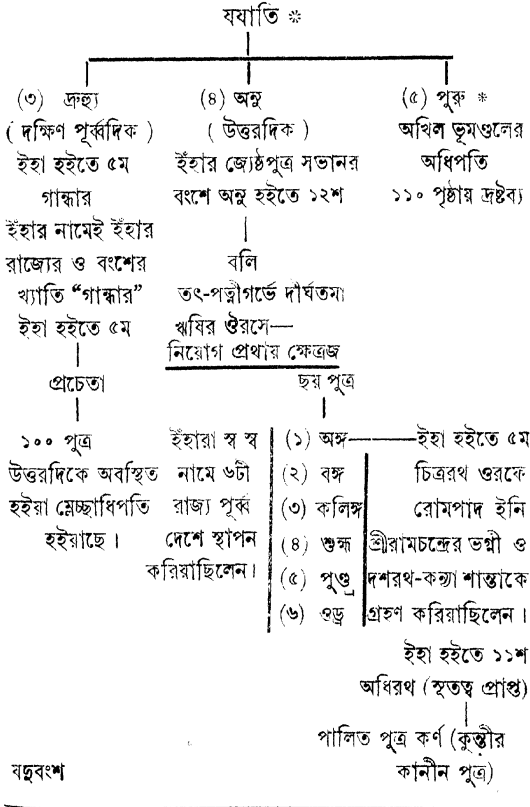
* যযাতির ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে পুরু রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই বিবাহ অনুলোম প্রথাতে সিদ্ধ হইয়াছিল।

ক্রোষ্ট * ইহা হইতে ৫ম

চিত্ররথ

শশবিন্দু মহাযোগী, ১৪ রত্নের স্বামী ইহা হইতে ৭ম অপরাজিত-রাজ-চক্রবর্ত্তী

বিদর্ভ (পুত্রগণ মধ্যে বিখ্যাত)

ক্রথ ইহা হইতে ২১শ

সাত্বত

অন্ধক (ইহা হইতে ১০ম)

দেবক

দেবকী আদি ৭ কন্যা সকলেই বসুদেব পত্নী

উগ্রসেন

কংস (সগোত্র জরাসন্ধ কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন)

রোমপাদ (ইহা হইতে ৫ম)

চেদি ও চেস্থাদি নরপতির উৎপত্তি

বিদূরথ ইহা হইতে ৮ম

শ্রুতশ্রবা = দমঘোষ সগোত্র চেদিরাজ

বসুদেব ও সগোত্র দেবকের কন্যা ৭ জনকেই বিবাহ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দেবকী গর্ভে

শ্রীকৃষ্ণ

তাঁহার অন্যান্য ভাইগণ ইঁহারা সগোত্রীয়া কংস ভগ্নীগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

নহুষ
যযাতি
পুত্র পুরু হইতে ১৩শ
রন্তিনার (পুরু বংশ)
সুমতি ইহা হইতে ৪র্থ
দুষ্মন্ত + শকুন্তলা
ভরত
ভরদ্বাজ
অপ্রতিরথ
কণ্ব
মেধাতিথি
প্রস্কন্ন (প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হন)
বৃহৎক্ষত্র
মহাবীর্য্য
নর
গর্গ
হস্তী (হস্তিনাপুর নির্ম্মাতা)
দুরিতক্ষয়
সংস্কৃতি
শিনি
অজমীঢ়* (১১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
এয্যারুণ
কবি
পুষ্করারুণি
এই ৩জনই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।
গুরু
রন্তিদেব ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ ইঁহার মহানসে প্রত্যহ ২০০০ গো-হত্যা হইত।
গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ হইয়া-ছিলেন

অজমীঢ় * (পুরুবংশ)
প্রথমা স্ত্রীতে তিনপুত্র
বৃহদিষু
ঋক্ষ
প্রিয়মেধ
সংবরণ
ইঁহার বংশ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।
কুরু (ইঁহার ৪ পুত্র মধ্যে ২য় ও ৩য়)
সুধন্বু
ইহা হইতে ৫ম
জহ্নু
ইহা হইতে ১২শ
উপরিচর বসু
(চেদিদেশের রাজা)
প্রতীপ
(১১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
বৃহদ্রথ
২য়া স্ত্রী গর্ভে
মৎসী
(সত্যবতী)
+ শান্তনু
অন্যান্য পুত্রগণ
ইঁহারাও চেদিদেশের রাজা ছিলেন।
জরাসন্ধ
সহদেব
দুই কন্যা + কংস
সগোত্রে বিবাহ।

অজমীঢ় (পুরুবংশ)
দ্বিতীয় স্ত্রীতে একপুত্র
নীল
ভর্ম্ম্যাশ্ব (ইঁহার পুত্রগণের "পাঞ্চাল" খ্যাতি)
মুদ্গল
ইঁহা হইতে মৌদ্গল্য গোত্রীয়
ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত
মুদ্গলিনী (কন্যা)
[বৈদিক ঋষি]
অন্য
৪ পুত্র
দিবোদাস ইঁহা হইতে ৬ষ্ঠ
(যমজ)
অহল্যা + গোতম
ইঁহার প্রপৌত্র
সোমক ইঁহার সন্তান মধ্যে কনিষ্ঠ
শরদ্বান্
পৃষৎ
দ্রুপদ
কৃপাচার্য্য
শান্তনু রাজা মৃগয়ার্থ
বনে গিয়া কৃপ ও
কৃপীকে হস্তিনায়
আনেন।
কৃপী +
দ্রোণাচার্য্য
অশ্বত্থামা
ধৃষ্টদ্যুম্ন
দ্রৌপদী
(এই দ্রৌপদীর সগোত্র
৫ পাণ্ডব সহ বিবাহ)
ইঁহারা ভর্ম্ম্যাশ্ব বংশীয়
পাঞ্চাল।

পুরু-বংশ
প্রতীপ
দেবাপি
গঙ্গা + শান্তনু + সত্যবতী
বাহ্লীক
সোমদত্ত
ভীষ্ম
(দেবব্রত)
চিত্রাঙ্গদ
+অম্বিকা
বিচিত্রবীর্য্য+
অম্বালিকা
ভুরি
ভুরিশ্রবা
শল
নিয়োগ প্রথায় ব্যাসদেবের
ঔরসে ক্ষেত্রজ পুত্র
ধৃতরাষ্ট্র+গান্ধারী
সগোত্রা, গান্ধার
রাজকন্যাত্রয়।
দুর্য্যোধনাদি ১০০ পুত্র
কুন্তী +
নিয়োগ প্রথায়
দেবতার ঔরসে পুত্র
পাণ্ডু+ মাদ্রী
অশ্বিনীকুমার
ঔরসে নিয়োগ
প্রথায় পুত্রদ্বয়
যুধিষ্ঠির
+সগোত্রা
দ্রৌপদী
ভীম+
সগোত্রা
দ্রৌপদী
অর্জ্জুন+
সগোত্রা
(১) দ্রৌপদী
(২) সুভদ্রা
(৩) বিধবা
উলূপী।
নকুল
+সগোত্রা
(১) দ্রৌপদী
(২) চেদি রাজ-
কন্যা করেণুমতী
সহদেব
+সগোত্রা
দ্রৌপদী

এপর্য্যন্ত বিবাহ-পদ্ধতির আলোচনায় দেখা গেল, অনুলোম প্রতিলোম বা স্বগোত্র বলিয়া বিবাহে কোন বাধা ছিল না। আট রকম বিবাহ, স্বয়ংবর প্রথা, বিধবা-বিবাহ যাহা মনুসংহিতায় প্রচলিত ছিল তাহার মূল মন্ত্র ছিল এই বিধানটি,—

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতং।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥

মনু ২।২৪০ ॥

অর্থাৎ স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিত কথা এবং বিবিধ শিল্প সকলের নিকট হইতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে। এই বিধানই ছিল প্রথম স্তরের মূল নীতি।

মনুসংহিতায় বিরুদ্ধ ভাবের শ্লোক সমাবেশের ফল।

দ্বিতীয় স্তরের কথা বলিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকগণের দৃষ্টি বর্ত্তমান আকার-প্রাপ্ত মনুসংহিতার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাই। যে কেহ সংহিতাখানা ভাল করিয়া পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন সকল অধ্যায়ের মধ্যে এমন কতকগুলি বিরুদ্ধ ভাবের শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে যাহা মনু মহারাজের বেদাদর্শের সমস্ত ব্যবস্থাগুলিকে পণ্ড করিবার জন্যই যেন মনুসংহিতায় স্থান লাভ করিয়াছে। এই রকম শ্লোক, যে অধ্যায়ে, যে বিশেষ ব্যবস্থার বিধি রহিয়াছে, সেই অধ্যায়ে সেই সকল বিশেষ বিধির অগ্রে, পার্শ্বে এবং শেষে থাকিয়া মূল ব্যবস্থার গতিরোধ করিয়াছে।

আমরা বিবাহ-পদ্ধতির কথা বলিতে আসিয়াছি, সুতরাং বিবাহ বিষয়ে যে সকল বেদ-বিরোধী বিধান সংহিতায় রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে বেদানু-গামী মনু নিজ সংহিতায় অচল হইয়া আছেন অতঃপর তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মনু স্বয়ংই অচল।

বিবাহ-পদ্ধতি প্রথম স্তর শেষ হইল।

দ্বিতীয় স্তর

এই স্তরে প্রথম অভিযান হইয়াছিল,—প্রতিলোম প্রথায় বিবাহের বিরুদ্ধে। যদিও প্রতিলোম প্রথায় বিবাহের বিরুদ্ধে মনুসংহিতায় কোন বিধান দৃষ্ট হইল না—তথাপি অন্ত্যজ জাতির পরিচয়ে আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে বাধ্য হইয়াছি,—যে প্রথায় রাজা যযাতি ভৃগুবংশের (শুক্রাচার্য্যের) কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন—যে বিবাহের প্রথম পুত্র যদু, যে যদু-বংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রতিলোম প্রথায় বিবাহ ভৃগুনামধারী একজন মহর্ষি (?)র নিকট সমিচীন বোধ না হওয়ায় অন্ত্যজ জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। সে কথা আমরা তৃতীয় স্তরে বলিব।

প্রতিলোম প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান।

দ্বিতীয় অভিযান,—অনুলোম প্রথায় বিবাহের বিধান (১) সংহিতায় থাকাসত্ত্বেও উহা রোধ করিবার পক্ষে। এই অশাস্ত্রীয় কার্য্যের জন্য মনুসংহিতায়,—অত্রি, গৌতম, শৌনককে নজীর

(১) মনুসংহিতা. তৃতীয় অধ্যায়, ১২।১৩ শ্লোক।

স্বরূপে ভৃগু দাঁড় করাইয়াছেন সুতরাং প্রথমে অত্রি প্রভৃতি কি বলেন তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া সকলের শেষে ভৃগু যে মন্তব্য করিয়াছেন—তাহাও বলিব ; যথা,—মনুসংহিতায় আছে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা মোহবশতঃ যদি হীনজাতি স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্রপৌত্রাদির সহিত আপনাপন বংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ (১)

অনুলোম প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান।

অত্রি ও গৌতম মুনির মতে শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করিলেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হন। শৌনক বলেন,—শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করিয়া তাহাতে সন্তানোৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হন। ভৃগু বলেন, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সন্তান হইলে পতিত হয় ॥৩।১৬॥

সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করিয়া শূদ্রাকে প্রথম বিবাহ করিলে, ব্রাহ্মণ নরক প্রাপ্ত হন। তাহাতে সন্তানোৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন। অতএব সবর্ণা বিবাহ না করিয়া দৈবাৎ শূদ্রা বিবাহ করিলে, তাহাতে সন্তানোৎপাদন করিবে না ॥ ৩।১৭ ॥

যে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাস্ত্রী কর্ত্তৃক দৈব, পিতৃ ও আতিথ্য কার্য্য বিশেষরূপে সম্পন্ন হয়, তাঁহার হব্য-কব্য দেবলোক ও পিতৃলোক গ্রহণ করেন না এবং সেই গৃহস্থ তাদৃশ আতিথ্য দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে পারেন না ॥ ৩।১৮ ॥

অনুলোম প্রথা বন্ধ করিবার পক্ষে এপর্য্যন্ত সংহিতায় আমরা 'লজিক' দেখিলাম না। যাহা আছে তাহাকে 'ম্যাজিক'

(১) মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, ১৫ শ্লোক।

ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কিন্তু সকলের সেরা পরের শ্লোকটি! অশ্লীলতারও একটা সীমা আছে, এ ক্ষেত্রে তাহাও অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বোধ হয় শূদ্র কন্যা বলিয়াই—! আমরা মূল শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

লজিক নাই, আছে ম্যাজিক।

বৃষলী ফেন-পীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্নবিধীয়তে॥ ৩।১৯॥

উপরোক্ত শ্লোক স্ত্রী ও বালক বোধ্য ভাষাতে বঙ্গানুবাদ করিতে আমরা অক্ষম।

পাঠক দেখিলেন—অনুলোম প্রথা ছিল,—অনুলোম প্রথা দূর হইল। 'ছিল'তে চারবর্ণের মধ্যে যৌন সম্বন্ধে যে একতা ছিল—একজাতীয়ত্ব ছিল, 'দূর' হওয়াতে তাহা নষ্ট হইয়া গেল। এই ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ 'নীচ সংসর্গ' হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু "বিরাট পুরুষ ব্রহ্মার পাদযুগল" যে পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হইল, সে কথা ভাবিবার তখনও কেহ ছিলেন না, এখনও কাহাকে দেখিতেছি না।

মনুসংহিতায়,—'স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিত-কথা এবং বিবিধ শিল্পকার্য্য সকলের নিকট হইতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে' (১) এই সনাতন ব্যবস্থা বর্ত্তমান থাকাসত্ত্বেও কেন যে 'গুরু অনুমতি করিলে পর সমাবর্ত্তন-স্নান করিয়া সেই দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সুলক্ষণা সবর্ণা কন্যা

(১) মনুসংহিতা. ২য় অধ্যায়, ২৪০ শ্লোক।

বিবাহ করিবে' (১) এমন বিধান ভৃগু রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিশদভাবে বুঝিতে হইলে বর্ণপার্থক্যে কে অধিক লাভবান্ হইয়াছিলেন তাহা দেখিতে হইবে। (২)

যদিও মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক দ্বিজাতির পক্ষে 'সবর্ণাম=সমান জাতীয়াম্' অর্থাৎ অনু ও প্রতিলোম ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের মধ্যে, যাহার যেমন ইচ্ছা সে তেমন কন্যা বিবাহ করিতে পারে উক্ত আছে তবুও সেই শ্লোকের পরেই যখন ভৃগু ব্যবস্থা দিতেছেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের প্রথম বিবাহ সবর্ণা স্ত্রী প্রশস্ত কিন্তু কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে শূদ্র—শূদ্রকন্যা, বৈশ্য—বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা এইভাবে অনুলোম প্রথা ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত উঠিয়া শূদ্রকন্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে, (৩) তখন কিন্তু মূল ও ভাষ্য উভয়েই সন্দেহ হইল। শুধু কি ইহাই,—পূর্ব্ব শ্লোকে (৩।১৩) আমরা পরিষ্কার অনুলোম বিবাহ (তাহা কামবশতঃ হউক না কেন) প্রথা দেখিয়া ঠিক পরের শ্লোকে যখন দেখিলাম,—"ইতিহাসাদি কোন বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির বিপদকালেও শূদ্রাভার্য্যা গ্রহণের ব্যবস্থা নাই (৩।১৪)" তখন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, সংহিতা পড়িতেছি কিম্বা উপাখ্যান পড়িতেছি। কিন্তু যখন দেখিলাম একখানা সংহিতা শ্রদ্ধেয় ৺ভারতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক এবং অপর খানা শ্রদ্ধেয় ৺কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত

---

(১) ,, ৩য় ,, ৪ ,, ।

(২) পরিশিষ্ট দেখুন।

(৩) ,, ৩য় ,, ১২।১৩ ,, ।

তখন উভয় সংহিতাই ভাল করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম ঐ শ্লোকের ভাবার্থ প্রকাশ করিতে যাইয়া উভয়েই বলিতেছেন,—"ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত মতে অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণাদি শূদ্র-কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, এ বচনক্রমে প্রতিলোম বিবাহ নিষেধ করা হইয়াছে।" সুতরাং আপনারা 'ধন্য ধন্য' বলুন। যে শ্লোকের এত ভাব তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥

৩য় অধ্যায়, ১৪॥

পাঠক মূল শ্লোকে পাইলেন,—"ইতিহাসাদি কোন বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণাদি (দ্বিজাতির) বিপদকালেও শূদ্রা-ভার্য্যা গ্রহণের ব্যবস্থা নাই।" কিন্তু উভয় সংহিতার ভাবার্থে পাইলেন, "এই বচনক্রমে প্রতিলোম বিবাহ নিষেধ করা হইয়াছে"; সুতরাং বুঝিতে পারিলেন কি, গোঁজামিল দিতে আসিয়া উভয়েই স্বীকার করিয়া গেলেন, দ্বিজাতির মধ্যে তথাকথিত প্রতিলোম প্রথা প্রচলিত ছিল যাহা নিষেধ করিবার জন্য অন্য কোন শ্লোক না পাইয়া এই শ্লোকের সাহায্য লইতে হইল? অথচ শ্লোকের কোনখানেই প্রতিলোম প্রথার নাম পর্য্যন্ত করা হয় নাই! এই রকম বিধান, ব্রাহ্মণ বর্ণের হস্তে শাস্ত্রগ্রন্থ সকল যখন স্থানলাভ করিয়াছিল তখন হইতে—যত ইচ্ছা ব্রাহ্মণ বর্ণের সুবিধার জন্য যে রকম ইচ্ছা বিধান সকল মনুসংহিতায় বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। নতুবা একা মনু একবার সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া

প্রক্ষিপ্তের কারণ শাস্ত্রের উপর ব্রাহ্মণের একাধিপত্য।

যাহা লিখিলেন,—পরের শ্লোকেই তাহা অসনাতন তিনিই বলিলেন—একথা কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এখন দেখিতে হইবে কন্যার গুণাগুণ নির্ণয়ে সংহিতাকার কি বলিতেছেন।

কন্যার গুণাগুণ নির্ণয়

সংহিতায় আছে,—যে কন্যা মাতামহ হইতে পঞ্চমী না হয়, মাতৃবন্ধু ও মাতামহের সমানোদক না হয় এবং পিতা ও পিতৃবন্ধু হইতে সপ্তমী ও পিতার সগোত্রা না হয়, সেই কন্যা দ্বিজাতিগণের অগ্নিগ্রহণ ও পুত্রোৎপাদনের জন্য বিবাহে বিহিতা।" ৩৫॥ এই গেল গোত্রের কথা। এইবার কুলের কথা উঠিতেছে, যথা,—জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়ারহিত, বেদাধ্যয়নরহিত, অর্শ, যক্ষ্মা, অজীর্ণ, অপস্মার, শ্বিত্র, কুষ্ঠ-রোগযুক্ত এবং যে কুলে কন্যা ভিন্ন পুত্র নাই, সেই সকল প্রত্যক্ষদোষে দূষিত কুলে বিবাহ করিবে না॥" ৩৭ ॥

গোত্রের কথা নূতন বটে কিন্তু কুলের কথায় কিছু নূতনত্ব নাই। যেহেতু মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান যাহারা জানে না এমন লোক ও যক্ষাদি-রোগযুক্তা কন্যা কখন বিবাহ করিতে সম্মত হয় না। সুতরাং ইহা না লিখিলেও কিছু প্রত্যবায় ছিল না—কারণ, এই সকল বিষয় লোকে বংশপরম্পরাই জ্ঞাত হইয়া থাকে।—সুতরাং "যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম্ম ও যে বিবাহে যে গুণ, দোষ সমুদিত হয় এবং যে বিবাহোৎপন্ন সন্তানে যে যে গুণাগুণ জন্মে, সেই সকল আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে

বলিতেছি শ্রবণ কর (৩।২২)" বলিয়া যিনি বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মনু নহেন—ভৃগু। কেন এমন কথা বলিলাম তাহা পরে বলিতেছি। এখন ভৃগু যাহা বলিতে চান তাহা আপনারা অবধারণ করুন।

এইবার মৌলিকতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইবে। পাঠক! তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন।

ভৃগু বলেন,—

আনুপূর্ব্ব ক্রমে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব্ব—এই ছয় প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্মজনক, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই চারি প্রকার বিবাহ ধর্ম্মজনক; এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব্ব পৈশাচ এই তিন প্রকার বিবাহ ধর্ম্মজনক বলিয়া জানিবে ॥৩।২৩॥"

পাঠক বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন যে, ৩।২২ শ্লোকে "আমি বলিতেছি" রহিয়াছে। পরের শ্লোক (কবয়ো বিদুঃ) জ্ঞানবানেরা বলিতেছেন,—"ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য (সুতরাং পূর্ব্ব শ্লোকের ধর্ম্মজনক আসুর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ ঠিক পরের শ্লোকেই ব্রাহ্মণের পক্ষে বাদ পড়িল)। ক্ষত্রিয়ের রাক্ষস (সুতরাং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ঠিক পরের শ্লোকেই আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ বিবাহ নিষিদ্ধ হইল;) এবং বৈশ্য ও শূদ্রের আসুর বিবাহই প্রশস্ত ৩।২৪; সুতরাং বৈশ্য ও শূদ্রের গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ বিবাহ বাদ পড়িল। তার পরের শ্লোকেই বলা হইতেছে,—প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের মধ্যে

প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস—এই তিন প্রকার বিবাহ সকল বর্ণের ধর্ম্মজনক (যাহা ৩।২৪ শ্লোকে অস্বীকার করা হইয়াছে,) অবশিষ্ট আসুর ও পৈশাচ অধর্ম্মজনক বলিয়া নিষিদ্ধ হইল ॥৩।২৫॥

অথচ আটরকম বিবাহের শ্লোকে (৩।২১) বলা হইয়াছে এই আট রকম বিবাহ 'শাস্ত্র-সম্মত!' পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মজনক বিবাহ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া শাস্ত্ররক্ষকগণ ক্ষত্রিয়ের হাতে যে বিলক্ষণ বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পরের শ্লোকে দেখিতে পাইলাম। যেমন গুঁতো তেমনই ব্যবস্থা হইল,—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পৃথক পৃথক রূপে গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহের বিধান করা হইল। স্ত্রী-পুরুষের অনুরাগ সহকারে যুদ্ধাদি দ্বারা কন্যালাভ করার নাম গান্ধর্ব্ব রাক্ষস বিবাহ—ইহা স্মৃতি (মনু) সম্মত ॥৩।২৬॥ রাজার জাতি গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিতে পারিবে না; তাই ৩।২৪ শ্লোকে বলিবার পরই ৩।২৬ শ্লোকে বলিতে হইল "কে ও প্যাদা বাবা * * !"

এই প্রকার ক্রমাগত 'হাঁ,' 'না' শ্লোকে পূর্ণ বলিয়াই কি আমরা মনুসংহিতাকে <u>মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া থাকি ?</u>

সহজ বুদ্ধিতে দেখিতে গেলে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য এবং গান্ধর্ব্ব—এই পাঁচ প্রকার বিবাহ বিরোধশূন্য আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই তিন প্রকার বিবাহ বিরোধপূর্ণ। সমাজে গুণগত বর্ণের প্রচলন থাকিলে বিবাহে ইতরবিশেষ থাকা প্রয়োজন, কারণ উন্নত মানুষ উন্নত প্রণালীতে—অল্প উন্নত মধ্যম প্রণালীতে এবং অনুন্নত অধম প্রণালীতে বিবাহে

অনুরাগ দেখাইবেই। কিন্তু বর্ণ যখন গুণগত না হইয়া বংশগত হয় তখন সকল বর্ণে এই আট রকম বিবাহ প্রচলন থাকাই সম্ভব; কেননা বংশগত বর্ণে উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীর লোক থাকাই একান্ত স্বাভাবিক। আমরা কিন্তু ভৃগুর বিধানের মধ্যে না দেখিলাম হৃদয়ের স্পন্দন, না দেখিলাম সম্মুখ-সম্প্রসারিত উদার দৃষ্টি।

পাঠক, এইবার যে বিবাহ যেমন সন্তান হইলে সংহিতা-কার ভৃগু খুসী হইতে পারেন, তাহার উল্লেখ দেখিতে

বিভিন্ন শ্রেণীর পুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব কল্পন।

পাইবেন, যথাঃ—এই সকল বিবাহের মধ্যে মনু (?) যে বিবাহের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সমস্ত আপনাদিগের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৩।৩৬॥

ব্রাহ্ম বিবাহের সন্তান 'যদি' সুকৃতিশালী হন (হইবেন

"যদি"— ব্রাহ্ম।

কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই), তাহা হইলে ঐ পুত্র পিত্রাদি দশ পূর্ব্ব পুরুষ—পুত্রাদি দশ পর পুরুষ এবং আপনি এই একবিংশতি পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করেন॥ ৩।৩৭॥ পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন কি হেতুতে কোন্ বিবাহকে শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে। কিন্তু "যদি" প্রত্যেক বিধানের সঙ্গেই আপনারা দেখিতে পাইবেন। নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম, দৈবাদি বিবাহের সন্তান উৎকৃষ্ট হইবে একথা ভৃগু, সংহিতায় বলেন নাই। যেমন বলিতে পারিয়াছেন ৩।৪১ শ্লোকের কথা। তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

দৈব বিবাহের পুত্র ধার্ম্মিক হইলে পঞ্চদশ, প্রাজাপত্য বিবাহের সন্তান ধার্ম্মিক হইলে ত্রয়োদশ, আর্ষ বিবাহের পুত্র ধার্ম্মিক হইলে সপ্ত পুরুষকে পাপ-মুক্ত করেন ॥ ৩।৩৮ ॥

দৈব।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য বিবাহের সন্তান বেদাধ্যয়ন দ্বারা মহাতেজস্বী ও সাধু-জনের প্রিয় হয় ॥ ৩।৩৯ ॥ পাঠক, বেদাধ্যয়ন দ্বারা মহা তেজস্বী সন্তান এই বাঙ্গালা দেশে কত জন আপনি দেখিয়াছেন বলিতে পারেন? যদি না দেখিয়া থাকেন আপনি কি জানিতে প্রস্তুত আছেন যে,—"অবশিষ্ট আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে যে পুত্র জন্মে সেই ক্রূর, মিথ্যাবাদী, বেদ ও যজ্ঞাদি বিদ্বেষক" (৩।৪১) দ্বারা দেশ পূর্ণ রহিয়াছে? হিন্দুগণ! আমারও পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, বেদ ও যজ্ঞের কথা বলিলেই রক্ষণশীল দ্বিজাতি কেন তীব্র প্রতিবাদ তোলেন। আমরা কিন্তু অন্তরের সহিত জ্ঞান ও কর্ম্ম সমন্বয়ে বেদ ও যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা এদেশে দেখিতে চাই। যে হিন্দুর বেদ পাঠ নাই, যাগ নাই, যজ্ঞ নাই,—আত্মানুসন্ধান নাই, কিম্বা বেদ পাঠে, যাগ-যজ্ঞে এবং আত্মানুসন্ধানে স্পৃহা পর্য্যন্ত নাই, সে আবার কেমন হিন্দু।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ বিবাহজ পুত্রের প্রকৃতি ও তদ্দ্বারা বঙ্গদেশ পূর্ণ।

দ্বিতীয় স্তরে—(১) প্রতিলোম প্রথায় বিবাহ লোপ পাইল।

(২) অনুলোম প্রথা দ্বিজাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়া শূদ্র কন্যা বাদ পড়িল। (৩) বীর্য্য-প্রাধান্য ঘোষিত হইল।

বীর্য্য-প্রাধান্যের আলোচনা তৃতীয় স্তরে অন্ত্যজজাতির পরিচয়ের পূর্ব্বে করা হইবে।

এখন কেমন করিয়া ভৃগু,—বিধবা-বিবাহ ও নিয়োগ প্রথা রোধ করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা হইবে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ বিধবা-বিবাহ ও নিয়োগ প্রথার নাম শুনিয়াই হয়ত উষ্মা প্রকাশ করিবেন। কিন্তু আমরা যখন বিবাহ-পদ্ধতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি—তখন কর্ত্তব্যানুরোধে সকল কথারই আলোচনা করিব।

মূল শ্লোক একদিকে ও ভাষ্য অপর দিকে

মনুসংহিতায় ভৃগুরচিত শ্লোকের ভারতচন্দ্র শিরোমণি কৃত বঙ্গানুবাদ চলে একপথে, ভাষ্যকার আচার্য্য মেধাতিথির ভাষ্য চলে বিপরীত পথে! যদি কেহ মেধাতিথির ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ কখন বাহির করিতে পারেন, তখন সকলেই আমাদের কথার সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মেধাতিথির আদর্শ,—প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ, ভৃগুর আদর্শ,—বেদকে খর্ব্ব করিয়া বংশগত ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রাধান্য স্থাপন।

বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে ভৃগুর অভিযান।

মনুসংহিতায় ভৃগু বলেন,—বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে এ মত প্রকাশ নাই যে, একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ আছে এবং বিধবা-বিবাহক শাস্ত্রে এ মত লিখিত নাই যে, বিধবা বিবাহ সিদ্ধ॥ ৯।৬৫ ॥

পাঠক ইতিপূর্ব্বে আপনারা বিধবা-বিবাহের পক্ষে ঋগ্বেদের আদেশ এবং মনুসংহিতার বিধান দেখিয়াছেন। তবুও যখন ভৃগু বলিতেছেন, তখন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে বিধবা-বিবাহের মন্ত্র না থাকিলেও অর্জ্জুনের সহিত উলুপীর বিবাহে কোন বাধা হয় নাই কিম্বা নিয়োগ প্রথায় জন্মিয়া ধৃতরাষ্ট্রের রাজা হইবার পক্ষে কোন বিঘ্নও হয় নাই। তাহা ছাড়া মনুসংহিতায়,—পরিষ্কার ভাষাতে লিখিত আছে,—

বিধবা-বিবাহ ও নিয়োগ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ।

> যা পত্যা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া
> উৎপাদয়েৎ পুর্ণর্ভূর্ত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥ ৯।১৭৫ ॥

তবুও ভৃগু ৯।৬৫ শ্লোক বলেন কেন? কে বলিবে—কেন বলেন।

একটি মাত্র 'বিধবা-বিবাহ' বিধায়ক শ্লোকের গতিরোধ করিবার জন্য অতিবড় সাবধানী ভৃগু অনেক পূর্ব্ব হইতে নিষেধ প্রচার করিতেছেন। যথা,—নিয়োগ ব্যতিরেকে (পাঠক! দেখিবেন এখানে নিয়োগ প্রথা স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু পরে ৯ম অধ্যায়ে দেখিবেন উহাকেই পশুধর্ম্ম বলা হইয়াছে) পর-পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত পুত্র, স্ত্রীর পুত্রই নয় কিম্বা পরপত্নীগামী পুরুষের পুত্রও হইতে পারে না (ব্যাসদেব তবে পরাশরের পুত্র কেমন করিয়া হইলেন!), অতএব সৎস্বভাবা স্ত্রীর প্রতি কখনও দ্বিতীয় স্বামীর উপদেশ নাই ॥ ৫।১৬২ ॥

বিধবা-বিবাহের গতিরোধ প্রয়াস।

স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা নষ্ট করিবার জন্য ৯।৩ শ্লোকের

অনুরূপ ৫।১৪৮ শ্লোকেরও উদ্ভব হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে যে নিয়োগ ও বিধবা প্রথা সমর্থিত হইয়াছে তাহা পঞ্চম অধ্যায় হইতেই একটাকে ছাড়িয়া অপরটিকে বেড়িয়া ধরিবার ব্যবস্থা চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণের জন্য (৫।১৪৮) বিধানও যুক্ত হইয়াছে। শুধু কি সম্মুখ আক্রমণ (Frontal attack)ই চলিয়াছিল তাহা নহে। পার্শ্বদেশ (Flanking movement) হইতেও আক্রমণ চলিয়াছিল, যথা—পৌনর্ভব পুত্র ও জনক উভয়কে (ভৃগু) হব্য-কব্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন ॥৩।১৬৬; ৩।১৮১॥ এই শ্লোকদ্বয় তৃতীয় অধ্যায়ে রচনা করিয়া ভৃগু প্রমাণ করিয়াছেন সাবধানের বিনাশ নাই! আট ঘাট যতরকমে বন্ধ করা যায় তাহার কোন ত্রুটি ভৃগু রাখেন নাই। বিধবা-বিবাহের (৯।১৭৫ শ্লোকের) মাত্র একটি শ্লোক রহিয়াছে। তাহার গতিরোধ করিবার জন্য ভৃগু একবার বলিয়াছেন, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি (৯।৩ শ্লোক), আবার বলিয়াছেন,—পৌনর্ভব পুত্রের হব্য-কব্যে অধিকার নাই (৩।১৬৬) তারপর বলিয়াছেন বিধবার স্বামী হব্য-কব্যের অনধিকারী (৩।১৮১), শেষ বলিয়াছেন,—"বিবাহ-বিধায়ক যত মন্ত্র আছে তাহাতে বিধবার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে এমন কোন মন্ত্র নাই (৯।৬৫)।" বিধবা-বিবাহ বেদ-সম্মত সুতরাং তাহার গতিরোধ করিবার জন্য ভৃগু যত শ্লোক-জাল রচনা করিয়াছেন—তাহা সকলই অসিদ্ধ।

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা নষ্ট করিবার ব্যবস্থা ও তাহা হরণ জন্য বিধান।

ভৃগুর বেদবিরুদ্ধ মত অসিদ্ধ

নিয়োগ-প্রথার বিরুদ্ধে ভৃগুর অভিযান।

যে নিয়োগ প্রথা সনাতন ধর্ম্ম—তাহা মনু সংহিতার ৯ম অধ্যায়ের ৫৯।৬০।৬১।৬৯।৭০ শ্লোকে সমর্থন করা হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে ইহার বিরুদ্ধে কত শ্লোক যুক্ত হইয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে,—দ্বিজাতি কখন অন্যের স্ত্রীতে অন্য পুরুষ নিয়োগ করিবে না, এরূপ নিয়োগ যদি করে, তবে অনাদি পরম্পরাগত সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়॥ ৯।৬৪॥ এই বিরোধী শ্লোকের মধ্যে ৯।৬৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—বিধবা-বিবাহ বিধায়ক যত মন্ত্র আছে তাহাতে এমত প্রকাশ নাই যে, একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ আছে," একথা নিতান্তই মিথ্যা উক্তি। মন্ত্রে থাকুক বা না থাকুক এই নিয়োগ প্রথাতে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম, নিয়োগ প্রথাতে পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুহ্ম, পুণ্ড্র ইত্যাদির জন্ম ও তৎরাজ্যের সৃষ্টি, কত বলিব?

তার পরে,—"একের নারীতে অন্যের যে নিয়োগ, এধর্ম্ম মাননীয় নহে, (বেদ নিয়োগ প্রথা সমর্থন করিয়া অমাননীয় ব্যবস্থা করিয়াছেন কি?) বেন রাজার সময়ে এই পশু-ধর্ম্মের প্রচলন—সুতরাং আধুনিক মত বলিয়া ত্যাগ-যোগ্য। ৯।৬৬।

চমৎকার সত্য-ভাষণ! ঋগ্বেদে যে নিয়োগ প্রথার কথা রহিয়াছে তাহা যদি আধুনিক হইল—তবে প্রাচীনতম মত কোথায় মিলিবে? নিয়োগ প্রথা ৯।৭০ শ্লোকে সমর্থন করা

হইয়াছে। কিন্তু ঠিক পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে,—একের উদ্দেশে বাগ্‌দত্তা কন্যার বর মরিলেও, কন্যা অপরকে দান করিবে না, ইহা করিলে পুরুষ বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে যে পাপ, উক্ত ব্যক্তি ঐরূপ পাপে পাপী হয়। ৯।৭১।

বেদমত-বিরোধী শ্লোক অশাস্ত্রীয়, স্নতরাং ত্যাজ্য।

এত কথার পর আমরা "প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ" এই বাক্য গ্রহণ করিয়া নিয়োগ-প্রথার বিরুদ্ধে যত শ্লোক আছে উহা অশাস্ত্রীয় স্নতরাং অসিদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিলাম।

পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, সনাতন-ধর্ম্ম পালন করিলে হিন্দুজাতি স্বাধীন বা পরাধীন কোন অবস্থাতে তাহার বলক্ষয় বা সংখ্যা হ্রাস হইত না, তাহা যাঁহারা জাতি-বিভাগ-রহস্য পড়িয়াছেন এবং বিবাহ-পদ্ধতি পড়িলেন তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন— কেমন সীমাহীন উদার বিধানের উপরে মনু সংহিতা স্থাপিত ছিল। আমিষ প্রকরণেও সকলে দেখিতে পাইবেন—খাদ্য বিষয়ে বৈদিক ঋষিগণ অত্যন্ত উদার ছিলেন। তা ছাড়া মনুর বিধানে সকল পাপ কার্য্যই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু ভৃগুর বিধানে গণ্ডি, গণ্ডির পর গণ্ডি—তদ্যোপরি গণ্ডি দিয়া এবং লঘুপাপে জাতি-চ্যুতির ইঙ্গিত দিয়া হিন্দু জাতিকে পঙ্গু করিয়া মৃত্যুর মুখে দ্রুত চালিত করিয়াছেন। গণ্ডি দিয়া সমাজ-শরীর পুষ্ট হইবার পথরুদ্ধ করিয়া এবং জাতি-চ্যুতি পথে সমাজ শরীর ক্ষয় করিতে যাইয়াই আজ হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস ঘটিয়াছে। একথা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজ কিছুতে স্বীকার করিবেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করিবেন না। কিন্তু হিন্দু বলিতে

ত শুধু ব্রাহ্মণ-সমাজই নহেন তাই তথাকথিত অব্রাহ্মণদের বিচারের উপর নির্ভর করিবার জন্যই এই আলোচনা জানিতে হইবে; এবং ইহাও জানিতে হইবে,—যে জন্য ইংরাজজাতি প্রাণ থাকিতে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিতে পারে না ঠিক সেই হেতুতে ব্রাহ্মণ-সমাজও প্রাণ থাকিতে বেদের প্রচলন গৃহ্য-সূত্রের মতে কর্ম্ম-প্রবাহ এদেশে কিছুতেই চালাইবেন না। চালাইতে গেলে প্রথমেই বংশ-গত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম লোপ পাইবে।

বর্ত্তমান মনু-সংহিতায় বেদ-বিরোধী শ্লোকের নিদর্শন।

পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, মনুসংহিতায় মনুমহারাজকে অচল করিবার জন্য মনূক্ত বিধানের অগ্রে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে ভৃগু বেদ-বিরোধী শ্লোকসকল রচনা করিয়াছেন; তাহার অনেক নিদর্শন পূর্ব্বে দেখাইয়াছি এইবার বিবাহে কন্যার বয়স নিরূপণে ভৃগু কি বলেন তাহাও আমাদিগকে দেখিতে হইবে। মনু-সংহিতায় আছে,—

অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদান বিধি।

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্‌যথাবিধি॥ ৯।৮৮

বঙ্গানুবাদ,—কুল এবং আচারে উৎকৃষ্ট, সুরূপ এবং স্বজাতীয় বর পাইলে কন্যার বিবাহযোগ্যা বয়স না হইলেও উহাকে যথাবিধানে সম্প্রদান করিবে।

ভাষ্যানুবাদ—(ভাষ্যকার—আচার্য্য মেধাতিথি)

উৎকৃষ্টায় ও 'অভিরূপায়'—ইহাদের মধ্যে বিশেষণ বিশেষ্য-ভাব, অর্থ—'উৎকৃষ্টতরায়'। অথবা জাতি প্রভৃতির দ্বারা উৎকৃষ্ট, এবং অভিরূপ পৃথক্ বিশেষণ। অভিরূপের অর্থ সুন্দর

আকৃতিযুক্ত বা সুন্দর স্বভাবযুক্ত; বিদ্বান্‌কেও অভিরূপ বলা যায়। 'সদৃশ' অর্থাৎ জাতি প্রভৃতির দ্বারা সদৃশ। বর—জামাতা। অপ্রাপ্তা—অযোগ্যা, যে বালিকার এখনও কুমারী বয়স হয় নাই। অন্য স্মৃতিতে 'নগ্নিকা' বলা হইয়াছে; যাহার এখনও কামস্পৃহা উৎপন্ন হয় নাই; ছয় বা আট বৎসরের বালিকা; অত্যন্ত বালিকাও নহে ইত্যাদি।

এই রকম ব্যবস্থার অর্থ যাহাতে প্রাপ্তবয়স্কা ব্রাহ্মণ-কুমারী কোন ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র-পুত্রকে বিবাহ করিতে না পারেন। বিবাহের দ্বারা যে এক জাতীয়ত্ব তাহা যাহাতে না থাকে ইহাই হইল এই রকম ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য।

আচার্য্য মেধাতিথি এই (৯ম অধ্যায়ের ৮৮) শ্লোকের ভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ,—"বিবাহ-ব্যাপারে 'অনগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা'। অর্থাৎ ঋতুমতী কন্যাই বিবাহে প্রশস্তা। কিন্তু সুন্দরতর বা পণ্ডিত অথবা জাত্যাদি দ্বারা উৎকৃষ্ট এবং রূপবান্ বিদ্বান্ এবং জাত্যাদি দ্বারা সদৃশ বরকে 'নগ্নিকা' অর্থাৎ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেও যথাবিধানে কন্যাদান করা যাইতে পারে,"—ইত্যাদি। আচার্য্য মেধাতিথি ভাষ্যকার তিনি বার্ত্তিককার হইলে পরিষ্কার বলিতেন—এ ব্যবস্থা প্রক্ষিপ্ত। সুতরাং কদাচ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

আমরা কিন্তু বালিকা কন্যা বিবাহের অগ্রদূত বলিয়া এই বিধানটিকে গ্রহণ করিলাম। কথাটা পরিষ্কার করিয়া দেখাইবার জন্য পরের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতে হইল,—যথা,—ঋতুমতী হইয়াও কন্যা

পরবর্ত্তী শ্লোকে অন্যরূপ বিধি।

যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, সেও বরং ভাল, তথাপি কন্যাকে বিদ্যাগুণাদি-রহিত পুরুষকে কদাচ দান করিবে না ॥৯।৮৯॥

পিত্রাদি যদি গুণবান্ বরকে কন্যা সম্প্রদান না করে, তবে কন্যা ঋতুমতী হইয়াও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, পরে স্বয়ম্বরা হইবে ॥৯।৯০॥

পিত্রাদি কর্ত্তৃক অদীয়মানা কন্যা যদি যথাকালে ভর্ত্তাকে বরণ করে তাহাতে কন্যার কিছুমাত্র দোষ হয় না এবং উক্ত ভর্ত্তার কোন দোষ নাই ॥৯।৯১॥

পূর্ব্বে যে বলিয়াছি—মনুকে মনু-সংহিতার মধ্যে অচল করিবার জন্য ভৃগু মনুর বিধানের অগ্রে, পার্শ্বে ও পরে ব্যবস্থা রচনা করিয়াছেন—তাহা ৯।৮৯ ও ৯।৯০ শ্লোকের পূর্ব্বে ৯।৮৮ শ্লোক দেখিয়াও কি পাঠক, বুঝিতে পারিলেন না—ভৃগুর মতলব কি—এবং কোন পথে তিনি সমাজকে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট ?

এবার বরকন্যার বয়স নিরূপণ শ্লোকটি দেখুন। মূলে আছে,—

পশ্চাতের শ্লোক—

ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোহষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরম্ ॥ ৯।৯৪।

সীদতি—সদ্‌ধাতু হইতে। সদ্‌ধাতুর অর্থ,—(১) অবসন্ন হওয়া (২) কর্ত্তন করা (৩) উপবেশন করা।

কুল্লুক ভট্ট প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া টীকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ এই,—"ত্রিশ বৎসরের যুবা বার

বৎসরের মনোহারিণী কন্যাকে বিবাহ করিবে। চব্বিশ বৎসরের যুবা আট বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিলে গার্হস্থ্যধর্ম্ম সত্বর অবসাদ প্রাপ্ত হয়। ইহা বিবাহ-যোগ্য কাল দেখাইবার জন্য নহে। প্রায় এই সময়ের মধ্যে বেদপাঠ শেষ হইয়া থাকে—যুবকের বয়সের ⅓ অংশ বয়সের কন্যা বিবাহ করাই উপযুক্ত।"

কুল্লুক ভট্টমতে বরের বয়সের ⅓ অংশ বয়স কন্যার হইবে।

মূল শ্লোকটিতে ⅓ অংশ বয়সের কথা নাই। মূলের ঠিক বঙ্গানুবাদ এই,—ত্রিশ বৎসরের যুবা বার বৎসরের মনোহারিণী কন্যাকে বিবাহ করিবে। চব্বিশ বৎসরের যুবা ৮ বৎসরের কন্যা বিবাহ করিলে গৃহস্থ ধর্ম্ম (১) অবসাদ প্রাপ্ত হয় অথবা (২) গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে স্থিতি হয়। সদ্‌ধাতু হইতে সীদতি শব্দটি থাকার জন্য এই শ্লোকের বিপরীত অর্থও হইতে পারে।

কিন্তু উহা মূল শ্লোকে নাই।

নবম অধ্যায়ের ৮৯ ও ৯০ শ্লোকের পূর্ব্বে ৯।৮৮ ও পরে ৯।৯৪ শ্লোক—অতি সাবধানী ভৃগু ভিন্ন মনু-সংহিতায় কে এমন ভাবে মনুকে অচল করিবার জন্য রচনা করিয়াছিল? মনু মহারাজ ত উন্মত্ত ছিলেন না—যে আদর্শ-বিচ্যুতি ঘটাইয়া তিনি এক বিধান অপর বিধান দ্বারা খণ্ডন করিবেন? এই আবর্জ্জনারাশি তবে কোথা হইতে আসিল এবং কেই বা বিধি-বদ্ধ করিল তাহা পাঠকগণ, বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু ৺ভারতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত মনু-সংহিতায় এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ লিখিত আছে,—ত্রিশ বৎসর-বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে, চতুর্ব্বিংশবর্ষ-

বয়স্ক ব্যক্তি অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবে ; ইহা প্রদর্শন মাত্র। তিনগুণ অধিক বয়স্ক পুরুষ একগুণা কন্যাকে বিবাহ করিবে ; ইহার ন্যূনাধিকে বিবাহ করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয় ॥৯।৯৪॥

চমৎকার! যেমন অঙ্কশাস্ত্রে একতৃতীয়াংশ ঠিক রাখা হইয়াছে, তেমনই বঙ্গানুবাদও যথাযথ করা হইয়াছে! হিন্দুর ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি যেন 'হরি ঘোষের গোহাল।' যাঁর যেমন অভিরুচি তিনি তেমন মনের কথা ছাপার অক্ষরে লিখিয়া অমর হইয়াছেন। এখন বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে,—ভৃগু যে বিবাহ-যোগ্যা কন্যার বয়স-নির্দ্ধারণে বরের ১/৩ অংশ নিরূপণ করিলেন এবং ৯।৮৯ শ্লোকের ভাষ্যে বেদজ্ঞ ভাষ্যকার মেধাতিথি যে বলিলেন,—"প্রাগৃতোঃ কন্যায়া ন দানম্" অর্থাৎ 'অঋতুমতী কন্যা দান করিবে না,' ইহার কোন্‌টা প্রবল থাকিবে? আমরা বলিব যে পর্য্যন্ত ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদ বা গৃহ্যসূত্রাদি হইতে কেহ না দেখাইতে পারিবেন যে বরের একতৃতীয়াংশ বয়স কন্যার হইবে সে পর্য্যন্ত "প্রাগৃতোঃ কন্যায়া ন দানম্" ই প্রবল রাখিতে হইবে। কারণ, ইহাই সনাতন-ধর্ম্ম।

বিবাহ-ব্যাপারে সনাতন ধর্ম্ম।

অতএব হিন্দু-সমাজ, বিবাহ-ব্যাপারে যাহা সনাতন ধর্ম্ম তাহা জানিয়া রাখুন ; যথা :—স্বয়ম্বর প্রথা। এই প্রথা যে সমাজে প্রচলন—সে সমাজে কখন "বর্ণ"-গত বিবাহ একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং অনুলোম ও প্রতিলোম প্রথায় বিবাহ 'স্বয়ম্বর' পথে অনুষ্ঠিত হইত

—জানিতে হইবে। ইহা ছাড়া যে আট রকম বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, সে বিবাহও প্রচলিত ছিল,—'কন্যা, রত্ন, বিদ্যা প্রভৃতি সকলের নিকট হইতে (মনু ২।২৪০) সকলে গ্রহণ করিতে পারিবে' এই নিয়মে। এবং ইহাও জানিয়া রাখুন—ঋতুমতী না হইবার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ প্রশস্ত ছিল না—"প্রাগৃতোঃ কন্যায়া ন দানং," ইহাই সনাতন বিধি। সুতরাং রজস্বলা কন্যা বিবাহ দেওয়া যে দোষাবহ উহা নিছক অশাস্ত্রীয় কথা জানিতে হইবে।

কন্যার বয়স।

বিধবার জন্য—স্বেচ্ছায় বিবাহের ব্যবস্থা যাহা রহিয়াছে উহা সনাতন ধর্ম্ম। নিয়োগ প্রথাও তাই। এই সকল ব্যবস্থাই বেদে উক্ত আছে। যে ব্যবস্থা বেদে উক্ত আছে তাহাই সনাতন এবং সকল যুগের জন্য জানিতে হইবে। কিন্তু মহর্ষি অত্রি, শৌনক, গৌতম এবং ভৃগুর 'কৃপায়' যে ভাবে দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পাঠক, দেখিলেন। এইবার ভৃগু কেমন করিয়া তৃতীয় স্তর সৃজন করিয়াছিলেন তাহাও দেখুন।

বিধবা
নিয়োগ
ঐ সব ব্যবস্থাই
বেদে উক্ত।

দ্বিতীয় স্তর সমাপ্ত।

তৃতীয় স্তর

এই স্তরে নবম অধ্যায়ের আলোচনা হইবে। মনুসংহিতায় আছে,—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥৯৷৩॥

অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করেন। কোন অবস্থায় স্ত্রী স্বাধীনা নহেন।

জগতের সভ্য, অসভ্য সকল দেশে, কন্যাকে পিতা, স্ত্রীকে স্বামী এবং মাকে পুত্রগণ রক্ষা করিয়া থাকেন—কিন্তু তাই বলিয়া কন্যা কেন স্বাধীনা নহেন—তাহা বুঝিতে হইলে এই অধ্যায় ভাল করিয়া পাঠ করা প্রয়োজন।

এই নবম অধ্যায়ে—(১) স্বয়ম্বর-প্রথা রহিয়াছে। (২) বিধবা-বিবাহ রহিয়াছে। (৩) নিয়োগপ্রথা রহিয়াছে। সুতরাং স্ত্রী কখন স্বাধীনা নহেন—এ প্রথা প্রচলিত থাকিলে স্বয়ম্বর, বিধবা-বিবাহ, বাধাপ্রাপ্ত হইবে—ইহা বলাই বাহুল্য।

ঋতুমতী কন্যাদান করা যখন হইতে পাপজনক বিবেচিত হইয়া অষ্টম, নবম, দশম বর্ষিয়া কন্যার বিবাহ প্রচলন হইয়াছিল তখন হইতে স্বয়ম্বর-প্রথা বন্ধ হইয়া গেল।

বিধবা-বিবাহ ও নিয়োগ প্রথা কি ভাবে বন্ধ হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তবুও এই অধ্যায়ে যখন বিধি ও নিষেধ এক সঙ্গে পাশাপাশি রহিয়াছে তখন আমরাও তাহা উল্লেখ করিয়া দেখাইব। তারপর 'বীর্য্য-প্রাধান্যের' পক্ষে যুক্তি ও তার ফলাফল দেখাইয়া বিবাহ-পদ্ধতি সমাপ্ত করিব।

বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে ভৃগু বলেন,—"নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ। ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং

পুনঃ ॥ মনুসংহিতা. ৯ম অধ্যায়, ৬৫ ॥ অর্থাৎ বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে তাহাতে নিয়োগ অর্থাৎ পরের ভার্য্যাতে সন্তান উৎপাদন করা কথিত হয় নাই এবং বিবাহ-বিধানে যত শাস্ত্র আছে, তাহাতেও বিধবা-বিবাহের বিধান উক্ত হয় নাই।

বিধবা-বিবাহের পক্ষে মনু বলেন,—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥ ৯।১৭৫ ॥

মনু মহারাজ বেদ সমর্থন করিয়াছেন—ভৃগু বেদ সমর্থন করেন নাই। নিয়োগ প্রথার বিপক্ষে ভৃগু বলেন,—৯ম অধ্যায়ের ৬৪।৬৫।৬৬।৬৮ শ্লোক। নিয়োগ প্রথার পক্ষে মনু বলেন,—নবম অধ্যায়ের ৬০।৬৯।৭০ শ্লোক।

মনু মহারাজ বেদানুগামী হইয়া নিয়োগের বিধি দিয়াছেন। ভৃগু বেদ-বিরোধী হইয়া উহা রোধ করিয়াছেন।

(১) সাধনা ∴ শূদ্রকন্যা বাদ (২) বীর্য্য-প্রাধান্য ∴ জাতিগত স্থায়ী বর্ণ-পার্থক্য।

এখন কেমন করিয়া গুণ-গত-বর্ণ সকল স্থায়ী বংশগত বর্ণে পরিণত হইল তাহা দেখিতে হইবে। মনু সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে আছে,—গুরু-অনুমতি-প্রাপ্ত দ্বিজাতি সমাবর্ত্তন স্নান সম্পাদন-পূর্ব্বক 'সবর্ণা' সুলক্ষণা ভার্য্যা গ্রহণ করিবে ॥ ৩।৪ ॥ এই শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য মেধাতিথি বলেন, সবর্ণাং অর্থ সমান-জাতীয়াম্। এই কথাতে দ্বিজাতির মধ্যে তথাকথিত অনুলোম ও প্রতিলোম প্রথা বহাল থাকিলেও শূদ্রকন্যা বাদ পড়িয়া গেল। তারপর ঘোষিত হইল 'বীর্য্যপ্রাধান্য'। বীর্য্যপ্রাধান্য বলিতে গেলে

স্বতঃই মনে আসিবে স্ত্রী যে বর্ণেরই কন্যা হউন না কেন ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য এবং শূদ্র-পুত্র, শূদ্রই হইবে। কিন্তু এই সময় হইতে নামের শেষে উপপদ (শর্ম্ম, বর্ম্ম, ভূতি, দাস) যুক্ত হইতে আরম্ভ করিল। যাহাতে কোন বর্ণ আর গণ্ডি ছাড়াইয়া যাইতে না পারে। তৃতীয়স্তরে যে স্থায়ী বর্ণ-পার্থক্য ঘটিয়াছিল তাহা সবর্ণা কন্যা বিবাহ প্রশস্ত এই বিধানের দ্বারাই ঘটিয়াছিল। তাহার সঙ্গে—বীর্য্য-প্রাধান্যের হেতুবাদও বড় কম ছিল না।

বীর্য্য-প্রাধান্য যে কি ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ইহার সহিত নিম্নের শ্লোকটি রক্ষা করা প্রয়োজন। যথা,—মনু বলেন,—

'ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো, নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥ ১০।৪ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনবর্ণই দ্বিজাতি, চতুর্থ এক শূদ্রবর্ণ, 'পঞ্চম' বলিয়া কোন বর্ণ নাই।

পাঠক! স্মরণ রাখিবেন—'নাস্তি তু পঞ্চমঃ' এই শব্দ কয়টি, আর স্মরণ রাখিবেন বীর্য্য-প্রাধান্য, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন ভৃগু কি ভাবে কোন পথে অন্ত্যজ জাতিদ্বারা দেশ পূর্ণ করিয়া অমর হইয়াছেন।

এইবার বীজ-প্রাধান্যের কথা আরম্ভ হইবে সুতরাং আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে,—সংহিতাকার কি মতলবে কোন্ পথ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। আলেয়ার আলোতে যেমন

পথ দেখা যায় না—এখানেও বিধান দেখিতে পাইবেন কিন্তু 'হেতু' দেখিতে পাইবেন না। সংহিতায় আছে, —"বীজ ও ক্ষেত্র এই উভয়ের মধ্যে বীজ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু উৎপন্ন সন্তান বীজের লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে॥" ৯।৩৫॥ বীজ যে শ্রেষ্ঠ তাহা এইবার উদাহরণ সহায়ে দেখান হইতেছে—যথা "ধান্যাদি যে জাতীয় বীজ, ক্ষেত্রে বপন করা যায়, যথাকালে বীজের অনুরূপ অঙ্কুরই জন্মিয়া থাকে। ধান্যের বীজে বুটের অঙ্কুর হয় না। অতএব বীজ শ্রেষ্ঠ॥ ৯।৩৬॥" "এই পৃথিবীই সকল ভূতের উৎপত্তি স্থান বলিয়া কথিত, কিন্তু বীজ পৃথিবীর কোন গুণ প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু স্বজাতীয় অঙ্কুরই জন্মাইয়া থাকে। অতএব বীজই শ্রেষ্ঠ॥ ৯।৩৭॥ "কৃষক এক সময়ে একরূপ কর্দ্দমে নানা জাতীয় বীজ বপন করিলেও বীজ সকল আপন আপন জাতীয় অঙ্কুর জন্মাইয়া থাকে। কর্দ্দম বলিয়া কোন বীজই তার গুণ গ্রহণ করে না॥ ৯।৩৮॥" ধান্য, শালি, মুগ, তিল, কলাই, যব প্রভৃতি শস্য বীজগুণ-অনুরূপ অঙ্কুরিত হয়, কেহই ক্ষেত্রের ধর্ম্ম গ্রহণ করে না॥ ৩৯।৩৯॥"

বিধান হেতুহীন।

শস্যসকল বীজ-গুণ-অনুরূপ অঙ্কুরিত হয় সত্য—সে হিসাবে 'পরাশর' পুত্র ব্যাস ঠিক আছেন। কিন্তু ব্যাসদেবের নিয়োগে যাঁহাদের উৎপত্তি সেই ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ক্ষত্রিয় হইলেন, এবং বিদুর শূদ্র রহিলেন—কেন? ধৃতরাষ্ট্রের মাতা কি দাসরাজকন্যা মৎস্যগন্ধা হইতেও বংশে নিকৃষ্টা ছিলেন নাকি? কে কি ছিলেন —তাহা পরে বিচার করিয়া দেখা যাইবে।

কিন্তু এখানে যে ভাবে ভৃগু নানা কথায় বীজ-প্রাধান্য

দর্শাইতেছেন তাহা ভাল করিয়া স্মরণ রাখিতে না পারিলে,—পরে যখন 'অপশদ' ও 'অপধ্বংস' এর সহিত পাঠকের দেখা হইবে, তখনই কিন্তু মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইবে। আমরা সংহিতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, (দ্বিজাতি) এবং শূদ্রও দেখিতে পাই। ইহাদের পিতৃ-পরিচয়ে ব্রহ্মাকে দেখিতে পাই—যিনি অশরীরী। সুতরাং বীজ-প্রাধান্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যেমন ভার্য্যা গ্রহণ করুন না কেন সন্তান হইবে ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির ঔরসে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। অবশ্য বংশগত জাতির এই হিসাবই বটে।

আমরা কিন্তু গুণগত জাতি ছাড়া বংশগত জাতি স্বীকার করি নাই। কিন্তু বিবাহ-পদ্ধতি আলোচনা করিতে আসিয়া তর্কস্থলে না হয় মানিয়া লইতেছি,—"শস্যসকল বীজ-গুণ-অনুরূপ অঙ্কুরিত হয়, কেহই ক্ষেত্রের ধর্ম্ম গ্রহণ করে না।" কিন্তু সংহিতায় প্রকাশ,—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী পত্নীতে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীতে, বৈশ্যের বৈশ্যা পত্নীতে এবং শূদ্রের শূদ্রা পত্নীতে উৎপন্ন সন্তান সজাতীয় হইবে॥ ১০।৫॥ সুতরাং সংহিতাকার বলিতে-ছেন সম-জাতীয় পুত্রই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভৃগু বলেন,—

অপশদ।
অপধ্বংসজ।

"যাহারা আনুলোম্যে দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন উহাদিগকে 'অপশদ' বলা যায়, এবং যাহারা প্রাতি-লোম্যে উৎপন্ন, উহাদিগকে 'অপধ্বংসজ' বলা যায়, ঐ উভয় প্রকার জাতিরা ব্রাহ্মণাদির উপকারক গর্হিত কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে"॥ ১০ অধ্যায়, ৪৬।

"ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে সম্ভূত সন্তান হীন মাতৃগর্ভ প্রযুক্ত মাতৃ হইতে উৎকৃষ্ট জাতি হইবে। ব্রাহ্মণাদির সমান ভাবাপন্ন হইবে না। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি হইবে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাজাত সন্তান মাহিষ্য-জাতি, বৈশ্যের শূদ্রাজাত সন্তান করণজাতি হইবে। মূর্দ্ধাবসিক্তের বৃত্তি হস্তি-অশ্বরথশিক্ষা, অস্ত্রধারণ; মাহিষ্যের বৃত্তি নৃত্য, গান, গণনা, শষ্যরক্ষা; পারশব-উগ্রকরণ জাতির বৃত্তি তিন বর্ণের শুশ্রূষা, ধনধান্যের অধ্যক্ষতা, নৃপসেবা, দুর্গ, অন্তঃপুর-রক্ষা ॥ ১০।৬ ॥"

"ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে, বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে জাতের বিধি বলিলাম, এক হইতে দুইবর্ণের ব্যবধানে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যজাত এবং ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাতে এবং ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাতে জাতের ধর্ম্মবিধি বলিতেছি ॥ ১০।৭ ॥"

সংহিতায় বীজ-প্রাধাণ্য স্বীকৃত হইয়াও পুনরায় তাহা ভাসাইয়া দেওয়া।

পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতকে অম্বষ্ঠ বলা যায় এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্রাজাতকে নিষাদ বলা যায়,—যাহাকে পারশব বলে॥ ১০।৮॥" পাঠক, বীজ-প্রাধান্য যে ভাসিয়া যায়। তারপর "ক্ষত্রিয় হইতে পরিণীতা শূদ্রাতে উৎপন্ন সন্তান অতি ক্রূরচেষ্ট ও নিষ্ঠুর কর্ম্মরত, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র সম্বন্ধীয় শরীর বিশিষ্টকে উগ্রজাতি বলা॥ ১০।৯॥" "ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাতে জাত এবং

ক্ষত্রিয়েব বৈশ্যা ও শূদ্রাতে উৎপন্ন এই ছয় সন্তান সবর্ণ পুত্র হইতে অপকৃষ্ট হয়েন ॥ ১০।১০॥”

নিরক্ষর দেশবাসীকে এত উদাহরণ সহায়ে যে ‘বীজ-প্রধান্য’ বুঝান হইল তাহাতে উগ্রজাতি ও মাহিষ্যকে ক্ষত্রিয়ত্ব, করণকে বৈশ্যত্ব নিষাদ ও অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণত্ব, প্রদান করিতে ত পারিল না! অথবা প্রতিলোম প্রথার বিবাহেও ‘বীজ’ রক্ষিত হইল না। তাহা হইলে বীজপ্রধান—ওটা ভূঁয়া কথা! কত ‘হাঁ’ ‘না’ হইয়াছে; আর কত হইবে। পাঠক! তবুও অনুলোম প্রথাতে যে বংশ পরিচয় পাইলেন, প্রতিলোম প্রথাতে তাহার আশা রাখিবেন না। রাখিলে, মন-ভঙ্গ হইয়া মনস্তাপই সার হইবে। সংহিতার কৃতিত্ব লক্ষ্য করিলে ইহাও দেখিতে পাইবেন—শুধু জাতিকে হেয় করিয়াই সংহিতাকার তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। কর্ম্মকেও ‘বড়-ছোট’ করিয়া দেখাইতেছেন। যাহার প্রভাবে বিদ্যাহীন, তেজহীন, ব্যবসাবুদ্ধিহীন দ্বিজাতি সন্তানকে গুণ ও সামর্থ্যানুসারে কর্ম্ম করিতে অপমান ও নরকভীতি আসিয়া বাধাপ্রদান করিয়া থাকে। হিন্দু-সমাজে যে ‘ছোট কাজ’ ‘উহা করা উচিত নয়’—এ বোধও ভৃগুর ন্যায় সংহিতাকারই সমাজে জাগাইয়া বর্ত্তমান ভারতে “বেগার সমস্যা” আনয়ন করিয়াছেন। মৌলিকতা থাকিলে এমনই হয়!

সংহিতায় জাতিকে হেয় ও কর্ম্মকে “ছোট-বড়” করতঃ অপমান ও নরক-ভীতি আদি প্রদর্শনে বেগার-সমস্যা সৃষ্টি।

মনু মহারাজ কিন্তু বলিয়াছেন,—‘আপনার যেমন বয়স,

সেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণ ধন, যে প্রকার বেদাধ্যয়ন, যাদৃশ কুলাচার তদনুরূপ বেশ-ভূষা বাক্য বুদ্ধি সহায়ে (কর্ম্ম করিয়া) ইহলোকে বিচরণ করিবে।' ৪।১৮ ॥

গীতায় শ্রীভগবান্ যিনি কর্ম্ম করিতে এত বলিয়াছেন তিনি কখন কর্ম্মে ছোটবড় দেখিতে পান নাই। তিনি অধিকারী, অনধিকারী দেখিয়াছেন এবং যে কর্ম্ম যাহার স্বধর্ম্ম সেই কর্ম্ম করিতে মৃত্যু যদি আসে তাহাও বরং শ্রেয়ঃ তবুও পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না।" বলিয়াছেন। সুতরাং ভৃগু কর্ম্মে যে ছোটবড়, নীচ-উচ্চ দেখিয়াছেন উহা তাঁহার বুদ্ধির ভ্রম মাত্র। এই বুদ্ধি ভ্রমের একটি কৌতুক-কর উদাহরণ না দেখাইয়া পারিলাম না।

বীজ ও ক্ষেত্র উভয়ই প্রধান।

পাঠক! সংহিতার নবম অধ্যায়ে ৪৮।৪৯।৫০। ৫১।৫২ শ্লোকে নানা কথায় দেখিতে পাইবেন,—বীজও প্রধান, ক্ষেত্রও প্রধান বলা হইয়াছে। সে কথার যুক্তি নাই,—আছে,—হেঁয়ালী।

প্রত্যেক সমাজে কতকগুলি প্রথা প্রচলিত আছে যাহা তৎসমাজের ধর্ম্মগ্রন্থে বিধিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু ধর্ম্মগ্রন্থে ঐ কথা আছে সুতরাং উহার একটা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। বিশেষতঃ সেই রকম ব্যাখ্যা করিতে যদি 'হাঁ' কে 'না' আর 'না' কে 'হাঁ' করিতে হয় তবে সে ব্যাখ্যার বালাই লইয়া বরং মরিতে ইচ্ছা হইবে, কদাচ ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা হইবে না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যাস ও ধৃতরাষ্ট্রাদির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যাসদেব পরাশরের পুত্র রহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু কুরুবংশের হইলেন—বিদুর দাসীপুত্র—শূদ্র থাকিলেন।—আমরা এ প্রসঙ্গে এই তথ্যই দেখিতে পাইতেছি, যেখানে যাহার পুত্রের প্রয়োজন—সে পুত্র তাহার হইত। প্রয়োজনে পুত্র জন্মিত, যাহার প্রয়োজন সে পাইত। তাই পরাশরপুত্র ব্যাস, পরাশরপুত্র বলিয়া পরিচিত ; ব্যাসপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু কুরুবংশ রক্ষার জন্য হইয়াছিলেন—বলিয়া কুরুবংশে অবস্থিত, বিদুর ব্যাসপুত্র হইয়াও শূদ্রনামে আখ্যাত। বীর্য্যের প্রাধান্য,—ধ্রুব সত্য। কিন্তু প্রয়োজনে,—যে পুত্র জন্মিত, যাহার প্রয়োজন সে পাইত, ইহাও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কথা। একথা কেইবা অস্বীকার করিবে ?

প্রয়োজনানুসারে পুত্র-জনম।

যাহার প্রয়োজন—তাহারই পুত্র।

এই কথাটি ভৃগু পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিলেন না। তাই নবম অধ্যায়ে প্রথমে বীজ প্রধান, পরে ক্ষেত্র প্রধান, শেষে বীজও ক্ষেত্র কেহই প্রধান নহে, সংহিতাকার ভৃগুই প্রধান—যাহার ফলে অর্থহীন, অশাস্ত্রীয় অন্ত্যজ জাতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন,—কি অদ্ভুত লোকাতীত প্রতিভা লইয়াই না ভৃগু সংহিতা-রচনায় মন দিয়াছিলেন ! এমনটি বুঝি আর হয় না !!

অন্ত্যজ জাতির পরিচয়ে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের যে আভাস পাইলাম তাহা এই,—

(ক) উচ্চবর্ণের পুরুষের নিম্নবর্ণের কন্যায় প্রীতি।

(খ) উচ্চ বর্ণের কন্যার নিম্নবর্ণের পুরুষে অনুরক্তি।

প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক মতি ও গতি রোধে সামাজিক বিপ্লবে বেদ ও মনু অচল

এই প্রাকৃতিক অনুরাগের সঙ্গে যে দেশে স্ত্রীপুরুষের পতি-পত্নী নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা আছে—সে দেশে অনুলোম ও প্রতিলোম প্রথা প্রবল থাকিবেই। নতুবা মনু ২য় অধ্যায়ে ২৪০ শ্লোকে "স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলে সকলের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারে" বলিতেন না। এই স্বাভাবিক গতিকে রোধ করিতে যাইয়া, গুণগত বর্ণকে বংশগত বর্ণে পরিণত করিতে, অনুলোম ও প্রতিলোম প্রথায় বিবাহ রোধ করিতে, ব্রাহ্মণের অযথা প্রাধান্য-রক্ষণে, শূদ্রকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে, নারী হৃদয়ের বিধবা) চিরবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দাবী অস্বীকার করিতে, স্ত্রী জাতিকে হেয় প্রচার করিতে, শূদ্র কন্যাকে কুৎসিৎ ভাষায় অপমান করিতে ভৃগু নির্ম্মম হইয়া যাহা করিয়াছেন তাহা জগতের ইতিহাসে বিরল। তাই মনুর নামে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজ তেমন —উল্লসিত নহেন, যেমন ভৃগুর নামে তাঁহারা ভাবে গদগদ হইয়া থাকেন।

এই ভাবের আতিশয্য যতদিন ব্রাহ্মণ-সমাজে বিদ্যমান থাকিবে ততদিন বেদ কিম্বা বেদানুগামী মনুসংহিতা ব্রাহ্মণ সহায়ে হিন্দু সম জ স্থান পাইবে না, পাইতে পারেও না।

এখন দেখিতে হইবে যে দেশে (৯ অধ্যায় ৩ শ্লোকে) ভৃগুর

ব্যবস্থায় কন্যা কদাচ স্বাধীনা নহেন অবস্থা ভেদে পিতা, স্বামী ও পুত্রাদির অধীনে থাকিতে আদিষ্ট, সে দেশে প্রতিলোম প্রথাতে যে সকল জাতির উদ্ভব হইয়াছে সেই প্রতিলোম প্রথায় উচ্চবর্ণের কন্যারা নিম্নবর্ণে কি করিয়া আগমন করিলেন,—পিতা কন্যাদান করিয়াছিলেন কিম্বা কন্যাকুল স্বাধীনা ছিলেন সে কথার উল্লেখ কিন্তু দৃষ্ট হইল না। কিন্তু ইহা দেখিতে বুঝিতে কাহার ও বিলম্ব হইবে না যে 'বর্ণহীন' ও অন্ত্যজ জাতির উদ্ভব উল্লেখ করিতে যাইয়া দ্বিজাতির মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম প্রথায় যে বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহা সন্তানের গতিপ্রাপ্তি দ্বারা নাকচ অর্থাৎ বন্ধ হইয়া গেল। সুতরাং বীজ-প্রাধান্য ভাসিয়া গেল। বেদাদর্শ-বিচ্যুত সংহিতা 'হাঁ' 'না' দ্বারা আত্মহত্যা করিয়া রাখিয়া গেলেন একদল অত্যাচারিত উৎপীড়িত তথাকথিত অন্ত্যজ জাতি—যাহার পরিচয় সংহিতার শ্লোকেই সকলে অবগত হইতে পারিবেন ; যথা—

বেদাদর্শ-বিচ্যুত সংহিতা দ্বারা আত্মহত্যা।

ক্ষত্রিয় হইতে বিপ্রকন্যাতে জাত সন্তানকে সূত বলা যায়, বৈশ্য পুরুষ হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্নকে মাগধ জাতি বলা যায় এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্নকে বৈদেহ জাতি বলা যায়॥ ১০ অধ্যায় ১১॥ এখানে বৈদেহ, মাগধ জাতি বৈশ্য হইবে না কেন? সূত কেন ক্ষত্রিয় হইবে না?

প্রতিলোম প্রথা-জাত জাতিসমূহ।

প্রসঙ্গক্রমে এইস্থলে উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি কথার আলোচনা করিতে চাই। মহাভারতাতীয় বংশাবলীতে দৃষ্ট হইবে

যে, ক্ষত্রিয় যযাতি হইতে ভৃগুবংশীয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা দেবযানীতে জাত পুত্র যদু প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইল। সূত হইল না কেন? তারপর—শূদ্র হইতে বৈশ্যাজাত সন্তানকে আয়োগব জাতি বলা যায়, শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়া পুত্রকে ক্ষত্তা বলা যায় এবং শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন সন্তান চণ্ডাল হয়, যাহা তাবৎ মনুষ্য হইতে অধম এবং বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে যে সন্তান হয়, ইহারা প্রতিলোম বর্ণশঙ্কর জাতি হয় ॥১০।১২॥ এই আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল বীজ-প্রাধান্যে ত শূদ্র হইবার কথা—তবে হয় না কেন?

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য-কন্যাতে জাত এবং ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্র কন্যাতে জাত সন্তান আনুলোম্যে যেরূপ স্পর্শাদিযোগ্য হয় এইরূপ প্রাতিলোম্যে একজাতি ব্যবধানে অর্থাৎ শূদ্রপুরুষ হইতে ক্ষত্রিয় কন্যাতে উৎপন্ন ক্ষত্তা এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত বৈদেহ, এই দুই জাতি স্পর্শাদি যোগ্য হইবে। এতাবৎ ইহা স্থির হইল যে, আনুলোম্যে একান্তরোৎপন্ন জাতিকে স্পর্শাদিযোগ্য বলায় একান্তরোৎপন্ন মাগধ এবং আয়োগব নামক জাতিও স্পর্শাদি-যোগ্য। কেবল চণ্ডালজাতি স্পর্শাদিযোগ্য নহে ॥১০।১৩॥ বোধ হয় শূদ্রগৃহে ব্রাহ্মণ-কন্যার আগমনের ফলেই এবম্প্রকার সাজা চণ্ডালকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। নতুবা বীজ-প্রাধান্যে চণ্ডাল ত শূদ্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। অথচ এই শূদ্র যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ন্যায় 'ব্রহ্ম-সম্ভব' ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভব বলিয়া মহাভারতে শূদ্রকে দ্বিজাতির জ্ঞাতি বলা হইয়াছে—তাহা যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা এই ব্যবস্থায় যে প্রমাদ গণিবেন তাহা বলাই বাহুল্য।

তারপর, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে একান্তরজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি দ্ব্যন্তরজাত অম্বষ্ঠ জাতি এবং ক্ষত্রিয় হইতে একান্তরদ্ব্যন্তর জাত সন্তান যদ্যপি মাতৃদোষে দুষ্ট, তথাপি মাতৃজাতির ন্যায় হয়। মাতৃজাতি তুল্য বলাতে ইহা উদিত হইল, ইহারা মাতৃজাতির সংস্কার-যোগ্য হইবে ॥ ১০।১৪ ॥ অতি সূক্ষ্ম বিচার বটে !

চমৎকার সূক্ষ্ম-বিচার !

ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যা-জাত উগ্রা, উহাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতকে আবৃত জাতি বলা যায়। ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠ কন্যাতে জাত পুত্রকে আভীর বলা যায় এবং শূদ্র হইতে বৈশ্যকন্যায় জাত আয়োগবী, উহাতে ব্রাহ্মণ হইতে যে সন্তান হয়, উহার নাম ধিগ্বণ ॥ ১০।১৫ ॥

শূদ্র হইতে বৈশ্যাস্ত্রীজাত আয়োগব, ক্ষত্রিয়াজাত ক্ষত্তা, ব্রাহ্মণীজাত চণ্ডাল—ইহারা পুত্র-কার্য্য-করণে অক্ষম জানিবে ॥ ১০।১৭ ॥

বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে জাত মাগধ, ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন বৈদেহ নামে পুত্র এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সূত—এই তিন ব্যক্তি পুত্রকার্য্যে অক্ষম ॥ ১০।১৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত নিষাদ নামক পুরুষ হইতে শূদ্রাস্ত্রীতে জাতকে পুক্কস নামে জাতি বলা যায় এবং নিষাদীতে শূদ্র হইতে জাতকে কুক্কুটক জাতি বলা যায় ॥ ১০।১৮ ॥ ভৃগু যে বলিয়াছেন, 'বীজই প্রধান' তবে পুক্কস, কুক্কুটক হয় কেন ?

শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত ক্ষত্তা, ঐ ক্ষত্তা হইতে উগ্রাস্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রকে শ্বাক বলা যায়, বৈদেহ পুরুষ-

কর্তৃক ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য-জাত অম্বষ্ঠাতে উৎপন্ন সন্তানকে বেণ বলে ॥ ১০।১৯ ॥

দ্বিজাতি পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপন্ন করে, উহারা যদি উপনয়ন-সংস্কার-বিহীন হয়, তবে ঐ সন্তানদিগকে ব্রাত্য বলে। প্রতিলোমজ পুত্রের ন্যায় ঐ পুত্র পুত্রকার্য্যে অক্ষম, এই বলিবার জন্য প্রতিলোমজ পুত্রের মধ্যে গণ্য হইল ॥ ১০।২০ ॥

ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে, ইহাকে ভূর্জকণ্টক নামে জাতি বলা যায়, ভূর্জকণ্টক অন্যান্য দেশে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ, শৈখ ও বলে ॥ ১০।২১ ॥

ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড় নামক পুত্র জন্মে, দেশভেদে নামভেদ মাত্র ॥ ১০।২২ ॥

ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে সুধন্বাচার্য, কারূষ, বিজন্ম, মৈত্র, সাত্বত নামক পুত্র জন্মে ॥ ১০।২৩ ॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরস্পরের স্ত্রীতে গমনে সগোত্রাদি অবিবাহ্য স্ত্রী-বিবাহে উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগে বর্ণসঙ্করজাতি-ভাবাপন্ন হয় ॥ ১০।২৪ ॥

যে সকল বর্ণসঙ্কর প্রতিলোম ও অনুলোম দ্বারা জন্মে, ঐ সকল সঙ্করজাতি ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১০।২৫ ॥

সূত, বৈদেহ, চণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা, আয়োগব এই ছয়টি প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিশেষ কহিবার নিমিত্ত পুনরায় বলিলেন ॥ ১০।২৬ ॥

এই ছয় সন্তান আপন আপন জাতীয় স্ত্রী এবং বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণী উৎকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীতে ও অপকৃষ্ট শূদ্রাতে যে

সন্তান উৎপাদন করে, উহারা সকলে মাতৃজাতি সদৃশ হয়। পিতা হইতে অপকৃষ্ট জাতি হয়, উৎকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীতে অধম জাতি হয়, এস্থানে উহার কথন নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু যাহারা প্রতিলোমজ, সূত প্রভৃতি, ইহারা স্বজাতীয় স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপত্তি করে তাহা প্রতিলোমজ মাতাপিতা হইতে অধিক গর্হিত হয়, এই বলিবার জন্য উহা কথিত হইল। ব্রাহ্মণ মাতাপিতা হইতে জাত সন্তান উক্ত মাতাপিতা হইতে অধিক গর্হিত হওয়া উচিত। তাৎপর্য্য শুদ্ধ মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন সন্তান শুদ্ধ মাতৃ-পিতৃ-তুল্য জাতি হয় ॥ ১০।২৭ ॥

বীজ-প্রাধান্য অস্বীকার করার ফলেই সূক্ষ্ম বিচারের উদ্ভব। তাই সংহিতাকার ভৃগু 'অপশদ' ও 'অপধ্বংসজ' শব্দের ব্যাখ্যাতে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত 'বীজ-প্রাধান্য' স্বীকার করিলে আমাদের মনে হয়, এত জটিলতা ঘটিবার কোনও হেতু থাকিত না, সামাজিক বিপ্লবও এতদ্রুত ঘনাইয়া আসিত না।

সংহিতাকারের সূক্ষ্ম বিচার-লব্ধ ফল—তথাকথিত অন্ত্যজ জাতির পরিচয় অর্থাৎ 'ছোটলোকের' কথায় যাঁহারা না থাকিতে চান, তাঁহারা একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিবেন প্রলয়ের মেঘ চতুর্দ্দিকে পুঞ্জিভূত হইতেছে। যে দিন ভারতে এ 'ছোটলোকের' দল জাগিয়া উঠিবে—সেদিনের প্রলয়ের মুখে উদার বা রক্ষণশীল বলিয়া উচ্চবর্ণের কেহ থাকিবে না। থাকিবে—শুধু উন্নত জাতির মৃত রাশির মধ্যে মৃত্যু-প্রতীক্ষাকারীর গভীর আর্ত্তনাদ। সে দিন—বহুদূর নহে।

তবুও এই অন্ত্যজ জাতির পরিচয় যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা দেখিবেন, সংহিতায় আছে,—যেরূপ ব্রাহ্মণের স্বজাতীয়া স্ত্রীতে এবং ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে উৎপাদিত সন্তান দ্বিজ হয়, এমত, বৈশ্য পুরুষ হইতে ক্ষত্রিয়া-জাত সন্তান এবং ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীজাত সন্তান কিঞ্চিৎ হীন হয়, অতিশয় গর্হিত নহে। তাৎপর্য্য শূদ্র-প্রতিলোমজ সন্তান অপেক্ষা দ্বিজাতি-প্রতিলোমজ সন্তান উৎকৃষ্ট ॥১০।২৮॥

সূত প্রভৃতি প্রতিলোম সঙ্কর জাতিগণ পরস্পর পরস্পরের স্ত্রীতে যে সকল সন্তান উৎপাদন করে, তাহারা পিতামাতা হইতে অতি হীন গর্হিত জাতি হয় ॥১০।২৯॥

যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে নিকৃষ্ট চণ্ডাল উৎপাদন করে, তেমন নিকৃষ্ট চণ্ডালও চতুর্ব্বর্ণ স্ত্রীতে অতি নিকৃষ্ট হীনজাতি জন্মায় ॥১০।৩০॥

সূত প্রভৃতি ছয়জন প্রতিলোম জাতির মধ্যে আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল এই তিনজন শূদ্র হইতে উৎপন্ন বিধায়, বাহ্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট, তাহারা চারিবর্ণের স্ত্রীতে ও আপন স্বজাতীয়াতে আপন হইতে নিকৃষ্টতর পঞ্চদশ হীনজাতির উৎপাদন করে, যথা আয়োগব, আপন স্বজাতীয়া স্ত্রীতে এক, শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণী এই চারিবর্ণের স্ত্রীতে চার, এই পাঁচজন হীনতর জাতির উৎপাদন করে এবং ক্ষত্তা ও চণ্ডাল, আপন আপন স্বজাতীয়া স্ত্রীতে এক একটি, শূদ্রা প্রভৃতি চারিবর্ণের স্ত্রীতে চার, এইরূপে প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচটি নিকৃষ্টতর জাতি জন্মায় এবং সূত, মাগধ, বৈদেহ এই তিন হীনবর্ণ ও আপন আপন

স্বজাতীয়া স্ত্রীতে এক এবং চারিবর্ণের স্ত্রীতে চার এইরূপে প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচটি হীনতর জাতির উৎপাদন করে। ১০।৩১॥ এই প্রকার অসম্ভব সূক্ষ্ম বিচারে—'বুদ্ধি বচন হারে!'

যে চারবর্ণ হইতে প্রতিলোমে অথবা অবৈধ অনুলোমে জন্মিয়া সর্ব্বধর্ম্মরহিত হয়, তাহাকেই দস্যু জাতি বলা হয়, তাদৃশ দস্যুজাতি পূর্ব্বোক্ত আয়োগব স্ত্রীতে সৈরিন্ধ্র নামে হীনজাতির উৎপাদন করে। সৈরিন্ধ্র জাতি, স্ত্রীলোকের কেশবন্ধন করে, সুগন্ধি দ্রব্যের মর্ম্মজ্ঞ হয়, কাহারও দাস হয় না, অথচ পাদসেবাদি দাসের কার্য্য করে এবং বিষাক্তবাণ প্রভৃতির দ্বারা পশুহিংসা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে ॥১০।৩২॥

বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত বৈদেহ, আয়োগব স্ত্রীতে মৈত্রেয় নামক জাতির উৎপাদন করে, মৈত্রয় মধুরভাষী এবং প্রতি মুহূর্ত্তে ঘণ্টা বাজাইয়া সকল মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করে॥ ১০।৩৩॥

ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাতে জাত নিষাদ, উক্ত আয়োগব স্ত্রীতে দাস নামক মার্গব জাতি জন্মায়, যাহার নৌকাচালন জীবিকা এবং যাহাকে আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ কৈবর্ত্ত বলে ॥১০।৩৪॥

যে মৃতের বস্ত্র ধারণ করে ও কদর্য্য ভোজন করে, সেই আয়োগবীতে জন্ম হইলেও সৈরিন্ধ্র, মৈত্রেয়, মার্গব,—এই তিনজন প্রত্যেকের জনক ভিন্ন বিধায় পৃথক পৃথক হীনজাতি হইবে ॥১০।৩৫॥

নিষাদ, বৈদেহ স্ত্রীতে, চর্ম্মচ্ছেদন বৃত্তি, কারাবর নামে জাতির উৎপাদন করে এবং বৈদেহ কারাবর স্ত্রীতে অন্ধ্র নামে

জাতি ও নিষাদ স্ত্রীতে মেদ নামে জাতির উৎপাদন করে, অন্ধ ও মেদ অতি নিকৃষ্ট বিধায় গ্রামের বাহিরে বাস করিবে॥ ১০।৩৬॥

চণ্ডাল হইতে বৈদেহ স্ত্রীতে, পাণ্ডু সোপাক নামে জাতি উৎপন্ন হয়; বাঁশ দ্বারা কীটাদি নির্ম্মাণ করা তাহার ব্যবসায়, এবং নিষাদ হইতে বৈদেহ স্ত্রীতে আহিণ্ডিক নামে জাতি জন্মে। জীবিকা ভিন্ন বিধায় আহিণ্ডিক, কারবর হইতে পৃথক্ ॥১০।৩৭॥

নিষাদ হইতে শূদ্রাতে উৎপন্না স্ত্রীর নাম পুক্কসী; পুক্কসীতে চণ্ডাল অতি নিকৃষ্ট পাপস্বভাব জহ্লাদের বৃত্তি, সোপাক নামে জাতির উৎপাদন করে ॥১০।৩৮॥

নিষাদী, চণ্ডাল দ্বারা অতিহীন অন্ত্যাবসায়ী নামে জাতি প্রসব করে, যাহারা শশ্মানে বাস করে, এবং মুর্দ্দাফরাশ নামে পরিচিত ॥ ১০।৩৯॥

পিতামাতা নির্দ্দেশপূর্ব্বক এই সকলকে হীন সঙ্কর জাতি বলা হইল। ইহারা গোপনে অথবা প্রকাশ্যভাবে জন্মিলেও কর্ম্মদ্বারাই উহাদিগের জাতির নিশ্চয় হইবে ॥ ১০।৪০ ॥

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ভার্য্যাতে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্যের বৈশ্যাতে উৎপন্ন তিন সন্তান এবং ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্য-ভার্য্যাতে জাত দুই সন্তান এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যভার্য্যাতে জাত দুই সন্তান,—এই ছয় সন্তান দ্বিজধর্ম্মী, ইহারা উপনয়ন সংস্কারের যোগ্য। সূত প্রভৃতি প্রতিলোমজাতগণ দ্বিজাতি মাতা হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহারা শূদ্রের মত ধর্ম্মাচরণ করিবে॥ ১০।৪১ ॥

বৈধ অনুলোমজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতি সন্তানগণ আপন

তপস্যা ও জন্মদাতার বীর্য্যের প্রভাবে হীনজাতীয় সংসর্গরহিত হইলে, বহু জন্মের পর পিতৃজাতি প্রাপ্ত হইতে পারে—ইহা বিশেষরূপে বলা হইবে ॥ ১০।৪২ ॥

পুরুষানুক্রমে উপনয়ন-সংস্কার লোপ ও বেদাধ্যয়নাদি-বর্জ্জিত হওয়া নিবন্ধন বর্ত্তমান ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১০।৪৩ ॥

পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, অপহ্নব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ—এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১০।৪৪ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অবৈধ অনুলোম ও প্রতিলোমজাত সন্তানগণ বর্ণবহির্ভূত ম্লেচ্ছভাষা অথবা আর্য্যভাষা যাহাই ব্যবহার করুন না কেন, মহর্ষিগণ তাহাদিগকে দস্যু বলিয়াছেন ॥ ১০।৪৫ ॥ অন্ত্যজজাতির পরিচয় শেষে হইল। কিন্তু বীজ-প্রাধান্যের যখন এত মাহাত্ম্য—তখন উহা রক্ষিত হইল না কেন ?

যাঁহার লোকাতীত প্রতিভায় অন্ত্যজ জাতির উদ্ভব হইয়াছিল, তিনিই কিন্তু বলিতেছেন,—

> শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
> অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥
>
> মনু, ২য় অধ্যায়, ২৩৮ ॥

অর্থাৎ * * * আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট কুল হইতে কন্যা-রত্ন বিবাহ করিবে। এখানে প্রশ্ন হইতেছে—অন্ত্যজের গৃহে সেই কন্যা যে 'রত্ন' তাহা সিদ্ধান্ত করিবেন কে ? ব্রাহ্মণ ?—তাহা হইলে অস্পৃশ্য জাতির উদ্ভবই হইত না। এই রকম শ্লোক

দেখিয়া মনে হয়,—বিধানটি রাজার জন্য রক্ষিত ছিল অন্যথায় এ রকম বিধানের দ্বারা অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতির সহিত সম্পর্ক-স্থাপনের চেষ্টা ভৃগু যে কখনও করিতে পারেন—তাহা ভৃগুর আচরণ দেখিয়া মনে হয় না।

কতকগুলি "অবৈধ" কার্য্য —অপছন্দ হইলেও, স্বীকৃত।

জগতে সকল জাতির মধ্যে এমন কতকগুলি অবৈধ কাজ চলিতেছে যাহা তৎতৎ সমাজ পছন্দ না করিলেও উহা রোধ করিতে পারেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা পাশ্চাত্য দেশের অনাথ (Orphan Church) আশ্রমগুলি উদ্ভবের কারণ উল্লেখ করিতে পারি। যে সমাজে অধিক বয়সে কুমারী কন্যার বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে সেখানে দু-দশটি অবৈধ সন্তান যে উৎপন্ন হইতে বাধ্য, একথা পূর্ব্বে সমাজপতিগণ জানিয়াও যেন জানিতে চাহেন নাই। কিন্তু অধিক দিন আর অস্বীকার করা যখন চলিল না তখন অনাথ আশ্রমের পত্তন আরম্ভ হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল আশ্রমে প্রতিপালিত সন্তানগণ অধিকাংশ স্থলেই পিতামাতার পরিচয় জ্ঞাত নহে।

পাশ্চাত্যে— অনাথ-আশ্রম

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মনু বিশেষ ভাবেই বুঝিয়াছিলেন 'প্রাগৃতোঃ কন্যায়া ন দানম্' যে সমাজের নিয়ম সেখানেও দুদশটি অবৈধ সন্তান উদ্ভব হইবেই। কিন্তু পাঠক দেখিবেন, পাশ্চাত্য ব্যবস্থার সঙ্গে মনু মহারাজের ব্যবস্থার পার্থক্য কত বেশী রহিয়াছে। মনুর বিশাল হৃদয় যাহা সহানুভূতি ও সমবেদনায় পূর্ণ ছিল, সে হৃদয় পাশ্চাত্য সমাজে যদি দেখিতে পাইতাম তবে

(Orphan Church) অনাথ আশ্রম না হইয়া মনু মহারাজের ব্যবস্থার অনুরূপ কিছু একটা দেখিতে পাইতাম। মনু মহারাজের মাথায় ঊর্ব্বর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভাব না থাকায় তিনি অনাথ আশ্রম না করিয়া পিণ্ড-তর্পণাধিকার প্রদান করিয়া তথাকথিত অবৈধ সন্তানের সকল সমস্যা সমাধা করিয়াছিলেন। পাঠক, আপনারা সংহিতায় দ্বাদশ পুত্রের কথা যে শুনিয়াছেন এইবার তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করুন; তাহা হইলে তুলনামূলকভাবে বুঝিতে পারিবেন কোন্ ব্যবস্থা সঙ্গত হইয়াছে। মনু বলেন,—যে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা আছে ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ এই ছয় প্রকার পুত্র বান্ধবও বটে, সগোত্র দায়াদও বটে অর্থাৎ ইহারা বান্ধবত্ব প্রযুক্ত পিতার ন্যায় সপিণ্ড সমানো-দকের পিণ্ড-তর্পণ করিবে। সগোত্রের ধনও পাইতে পারে, কিন্তু ভিন্ন গোত্র মাতামহাদির ধন পাইবে না শেষোক্ত কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দত্ত ও শৌদ্র এই ছয় প্রকার পুত্র সগোত্র বা ভিন্ন গোত্র সপিণ্ডাদি ধনহর নহে, কিন্তু বান্ধব হইবে অর্থাৎ বান্ধবত্ব প্রযুক্ত সপিণ্ড সমানোদকের পিণ্ড-তর্পণাধিকারী হইবে ॥৯।১৫৮॥

প্রাচ্যে—সমাজে গৃহীত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোন প্রথা সঙ্গত? মনু-স্বীকৃত ১২শ প্রকার পুত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইল, ঔরসাদি ছয় প্রকার পুত্র সগোত্র দায়াদ এবং সকলেই পিণ্ডতর্পণাধিকারী হয়। কিন্তু আমাদেরও দেখিতে হইবে কি অবস্থায় কোন্ পুত্র কি সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে তাহা

হইলে অবস্থাটা আমরা অনেকটা বুঝিতে সক্ষম হইব। মনু বলেন,—

(১) সবর্ণা পত্নীতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, উহা ঔরসপুত্র। অন্যান্য সকল পুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥৯।১৬৬॥

(২) অপুত্র মৃতব্যক্তির স্ত্রী, ব্যাধিযুক্ত ভর্ত্তার স্ত্রী, অথবা ক্লীবের স্ত্রীর নিয়োগ-প্রথাতে যে সন্তান, তাহাকে ক্ষেত্রজ পুত্র কহে ॥৯।১৬৭॥

(৩) অপুত্রককে প্রণয়ানুরোধে যে পুত্র অপরে প্রদান করে তাহাকে দত্তকপুত্র কহে ।৯॥১৬৮॥

(৪) অপরের পুত্রকে যে নিজ সেবার জন্য গ্রহণ করে সেই শুশ্রূষারত পুত্রকে কৃত্রিম পুত্র বলা যায় ॥৯।১৬৯॥

(৫) আপনার ভার্য্যাতে অজ্ঞাত পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত সন্তানকে গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলে ॥৯।১৭০॥

(৬) মাতাপিতা উভয়ে কিম্বা একের অবর্ত্তমানে অপরে যদি নিজ পুত্রকে ত্যাগ করে, সেই পুত্রকে যে আশ্রয় দেয় সেই ঐ গ্রহীতার অপবিদ্ধ পুত্র হয় ॥ ৯।১৭১ ॥

নিম্নলিখিত ছয় পুত্র সগোত্র, দায়াদ নহে। ইহারা বান্ধব অর্থাৎ সপিণ্ড সমানোদকে পিণ্ড-তর্পণাধিকারী জানিতে হইবে। যথা,—

(৭) পিতৃগৃহে কুমারী কন্যা পুত্র প্রসব করিবার পরে বিবাহিতা হইলে ঐ সন্তান ভর্ত্তার কানীন পুত্র নামে অভিহিত হইবে ॥ ৯।১৭২॥

(৮) জ্ঞাত বা অজ্ঞাত গর্ভ কন্যাকে যে বিবাহ করে ঐ সন্তান তাহার সহোঢ় পুত্র নামে পরিচিত হয় ॥ ৯।১৭৩॥

(৯) অর্থ দ্বারা যে সন্তান ক্রয় করা হয় সে সন্তান ক্রেতার 'ক্রীত' পুত্র নামে অভিহিত হয় ॥ ৯।১৭৪॥

(১০) পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা-স্ত্রী স্বেচ্ছায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে যে পুত্র সন্তান হইবে উহা ভর্ত্তার পৌনর্ভব পুত্র হইবে ॥ ৯।১৭৫ ॥

(১১) মাতাপিতাবিহীন অথবা পিতামাতাকর্ত্তৃক ত্যাজ্য পুত্র স্বয়ং আপনাকে যাহার নিকট দান করিলে সেই সন্তান গ্রহীতার স্বয়ংদত্ত পুত্র হইবে। ৯।১৭৭॥

(১২) ব্রাহ্মণের পরিণীতা শূদ্রা ভার্য্যাতে যে পুত্র উহার নাম পারশব বা শৌদ্র পুত্র পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন ॥ ৯।১৭৮॥

পাঠক, লক্ষ্য করিলেন কি পণ্ডিতেরা পারশব বা শৌদ্র সংজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন মনু মহারাজ অনুলোম প্রথাতে শূদ্র কন্যা বিবাহ করিতে বলিয়াছেন। সেইখানে সে পুত্রের পিতৃধনের দশমাংশের এক অংশ ভাগও ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী 'পণ্ডিতেরা' অন্য শ্লোক রচনা করিয়া ঐ প্রথা বন্ধ করিয়া যে শূদ্র জাতির সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন তাহাও দেখিয়াছেন। ইহাই সংহিতার পণ্ডিতগণের বিশেষ উদারতা!

পাঠক, পূর্ব্বে আপনারা দেখিয়াছিলেন—স্ত্রীজাতি স্বতন্ত্র নহেন (৯।৩)। পরে দেখিয়াছেন,—মনু সংহিতার যে বিধানে (৯।৬৫) * * বিবাহ-বিধানে যত শাস্ত্র আছে তাহাতেও বিধবার বিবাহে বিধান উক্ত হয় নাই, দেখিয়া যে বলিয়াছিলাম "বেদজ্ঞ বলিয়া মনু মহারাজের যে খ্যাতি ছিল তিনি

যে ৯।৬৫ বিধান দেন নাই” তাহা ৯।১৭৫ শ্লোক দেখিয়া পাঠক বিশ্বাস করিলেন ত? এই শ্লোকের টীকায় কুল্লুক ভট্ট বলিতেছেন,—যা ভর্ত্তা পরিত্যক্তা মৃত-ভর্ত্তৃকা বা স্বেচ্ছয়া অন্যস্য পুনর্ভার্য্যা ভূত্বা যমুৎপাদয়েৎ স উৎপাদকস্য পৌনর্ভবঃ উচ্যতে॥ সুতরাং বিধবা-বিবাহ সংহিতার মতে স্বীকৃত হইলেও কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে “স্বয়েচ্ছয়া” কথাটির উপরে। জোর করিয়া বিধবা-বিবাহ দিবার অধিকার যেমন কাহারও নাই; তেমন “স্বয়েচ্ছয়া” যে বিধবা পতি গ্রহণ করিবে তাহাতে বাধা দিবার অধিকারও কাহারও নাই। মানুষ নিজের দুর্ব্বলতা যেমন জানে তেমন অপরে জানিতে পারে না। তাই মনু মহারাজ ‘স্বয়েচ্ছয়া’ বলিয়া বিধবা-বিবাহে কন্যার সম্মতি ও অসম্মতি দুই পথই সমভাবে মুক্ত রাখিয়াছেন। ইহাই মনুমহারাজের বিশেষত্ব।

বিধবা-বিবাহ “স্বয়েচ্ছয়া।”

আমরা এই ‘স্বয়েচ্ছয়া’ কথাটির প্রতি ব্রাহ্ম ও আর্য্য-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। অত্যধিক বিধবা-বিবাহে উৎসাহ দেখাইলে বৈচিত্র্য লোপ হইবে। প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী যে সমাজের শোভা, একথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু জোর করিয়া বিধবাকে ব্রহ্মচারিণী রাখিতে গেলে যে গলদ হইয়া থাকে সেই জন্য এই ‘স্বয়েচ্ছয়া’ কথাটির উপরে আমরা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাই।

আমরা বেদের সহিত সংহিতার বিবাহ-পদ্ধতি মিলাইয়া দেখিতে যাইয়া দেখিলাম জাতি-গুণগত কিম্বা বংশগত যে

সনাতন ধর্ম্ম—আমিষ-প্রকরণ

মনু বলেন,—"চতুরাশ্রমীর মধ্যে গৃহাশ্রমীই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু যথাবিধি ভিক্ষা-দানাদি দ্বারা গৃহস্থই অপর তিন আশ্রমীকে রক্ষা করেন ॥৬।৮৯॥

"যেমন নদ নদী সাগরে অবস্থান করে সেইরূপ ব্রহ্মচারী বান-প্রস্থী ও যতিগণ গৃহস্থকে আশ্রয় করে ॥৬।৯০॥"

যে গৃহীকে শান্তির সময়ে আশ্রমত্রয় পালন ও সমাজ রক্ষা করিতে হয়, বিগ্রহে যাহাকে প্রাণ উপেক্ষা করিয়া দেশ, নারী ও ধর্ম্মের জন্য লড়াই করিতে হয়, যে গৃহী দুর্ব্বল হইলে নারীর মান ও ধর্ম্ম বিপন্ন হয়—যাহার দুর্ব্বলতা আশ্রয় করার অর্থই পরাধীনতা স্বীকার করা, যে গৃহাশ্রমীকে সংসার পালনের জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, যাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র-সহায়ে নিত্যকর্ত্তব্য যাগযজ্ঞ, দেব ও পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহার দেবতা ও পিতৃগণের প্রসন্নতার জন্য এবং নিজের শরীরকে কর্ম্মপটু রাখিবার জন্য কি রকম আহার করা শাস্ত্র-বিধেয় তাহা দেখানই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। গৌণ উদ্দেশ্য,—হিন্দু সমাজকে জানান, তাঁহারা শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া কি ভাবে নিত্য, দেব ও পিতৃকার্য্য করিতেছেন।

হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থের মধ্যে বেদ শ্রেষ্ঠ। তারপর বেদানুগামী মনুসংহিতা। 'মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতিরপধাস্ততে'—অর্থাৎ মনু-স্মৃতির বিপরীত সকল স্মৃতি পুরাণাদিই ত্যাজ্য।

কিন্তু মনুসংহিতায় যখন পরস্পর বিরোধী মত রহিয়াছে তখন

কোন্‌টি সম্যক ধর্ম্ম জানিতে হইলে বেদ জানা দরকার। যেহেতু মনু স্বীকার করিয়াছেন,—প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ। নতুবা ইহার মীমাংসা হওয়া সুদূর পরাহত।

প্রচলিত হিন্দু সমাজের বিশ্বাস—নিরামিষ ভোজী না হইলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে গৃহীর জন্য কিন্তু বিপরীত বিধানই দৃষ্ট হইবে। যে মধু মাংস প্রভৃতি আহার ব্রহ্ম-চারীর পক্ষে নিষিদ্ধ, সেই মধু মাংসই যে গৃহীর পক্ষে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সংহিতার আলোচনায় সকলেই দেখিতে পাইবেন; এবং ইহাও দেখিতে পাইবেন যে, এই অবস্থাভেদে ব্যবস্থার নামই অধিকার বাদ বা আশ্রম বিভাগ। এই অধিকার বাদ বেদ-সংহিতা-পন্থীদের নিজস্ব। তাই বেদ ও সংহিতায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনার উল্লেখ আছে যাহা অন্য জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থে নাই। ঋষিগণ জানিতেন,—বিচারপূর্ব্বক ভোগের দ্বারা যে ত্যাগ তাহা স্থায়ী হয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা যে ত্যাগ তাহা অধিকাংশ স্থলে সুফল প্রসব করে না। তাই প্রবৃত্তি মার্গে যে যাগ-যজ্ঞাদির বিপুল আয়োজন উহা প্রথমে স্বর্গাদি লোক ও পরে বিবেক এবং তীব্র বৈরাগ্য লাভের সহায়কই বুঝিতে হইবে। জৈন ও বৌদ্ধগণ ভোগের দ্বারা যে প্রকৃত ত্যাগ আসিতে পারে তাহা না বুঝিয়া মোক্ষলাভের জন্য অহিংসা ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের উপরই বেশী জোর দিয়াছিলেন। তাহার ফল এই হইল যে,—বৈরাগ্য-হীন কঠোরতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাহা হইবার—ব্যভিচারাদি সকল দোষই বৌদ্ধ-সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া সঙ্ঘকে হতমান ও ভারতকে পাতিত করিয়াছিল।

যতদিন হিন্দু সমাজে এই অধিকার বাদ প্রচলিত ছিল ততদিন হিন্দুবীর্য্য অমোঘ ছিল। বৌদ্ধ যুগের পর হইতে অধিকারবাদ হিন্দু প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে—তাই তাহার দুর্দ্দশারও অন্ত হইতেছে না। বেদ মানুষকে কর্ম্মের তথা ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগে পৌছাঁইয়া দিতে পারে। বৌদ্ধ বিধানে ভোগের স্থান নাই, সকলের জন্য সেই একই ত্যাগের বিধান। ইহাই বেদপন্থী ও বৌদ্ধগণের মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য। ধর্ম্ম শাস্ত্র বলেন,—যে ব্রহ্মচারী, সে মধু মাংস খাইবে না, স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না, বা জীব হিংসা করিবে না। কিন্তু যে বিবাহিত, সে ঘর বাঁধিবে (সংসার করিবে) জমি জমা বাড়াইবে, দিনরাত পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া পুষ্টিকর (মৎস্য, মাংস) আহার করিবে, প্রজোৎপাদন করিবে, মহোৎসাহে অর্থোপার্জ্জন করিবে, উপযুক্ত পাত্রে দান করিবে, সাম দান ভেদ দণ্ড নীতি সহায়ে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিবে, সর্ব্বোপরি প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া আততায়ীর হাত হইতে ধর্ম্ম, দেশ ও নারীর মান রক্ষা করিবে। নিত্য যাগাদি কর্ম্ম করিবে, যথাসময়ে দেবকার্য্য ও পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর, বানপ্রস্থ আশ্রম। এই আশ্রমে গৃহী একা বা সস্ত্রীক থাকিবেন—সঙ্গে থাকিবে গৃহোক্ত অগ্নি। এই অগ্নিতে দেব ও পিতৃকার্য্য নিত্য করিতে হইবে। সকলের শেষ—সন্ন্যাস আশ্রম বা অত্যাশ্রমী হইয়া ভিক্ষান্নের উপর নির্ভর ও যত্রতত্র বিচরণশীল। সুতরাং যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে সে ঘর বাঁধিবে না, স্ত্রী-প্রসঙ্গে থাকিবে না। গৃহীর ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না বলিয়া খুব পুষ্টিকর আহার

তাহার প্রয়োজন হয় না, প্রজোৎপাদন নাই, ধনোপার্জ্জনও নাই সুতরাং কর্ত্তৃত্বাভিমানে দানও নিষিদ্ধ, তাহার নিকট কেহ দোষী, কেহ প্রিয় হয় না। সুতরাং এজন্য তাহাকে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয় না। আর "সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতিকারপূর্ব্বকম্" বলিয়াই তাহাকে আততায়ীর বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে হয় না। নিয়ত ধ্যান-ধারণা করিবে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিক্ষা করিবে না॥ মনু-সংহিতা ষষ্ঠ অধ্যায়॥ পাঠক! দেখিবেন—এই চারি আশ্রমের ব্যবহারিক আদর্শ কত তফাৎ। বালক খেলা করিবে, যুবা অধ্যয়ন ও বলচর্চ্চা করিবে, বিবাহিত জীবনে ধর্ম্ম অর্থ দ্বারা সমাজকে উন্নত করিবে ইত্যাদি। সুতরাং বয়সের তারতম্যে মানুষের কার্য্যের তারতম্যও অবশ্যম্ভাবী—ইহাই অধিকার-বাদ। গৃহস্থ পুত্র-পরিবার লইয়া সন্ন্যাসীর বৃত্তি গ্রহণ করিলে না হইবে ভোগ, না হইবে যোগ। সন্ন্যাসী হইয়া গৃহস্থের বৃত্তি গ্রহণ করিলে না হইবে যোগ, না হইবে ভোগ। যাহা গৃহীর ধর্ম্ম তাহা কখনও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হইতে পারে না, যাহা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম তাহাও কখনও গৃহীর ধর্ম্ম হইতে পারে না। গৃহী সকল ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারে কিন্তু গৃহে থাকিয়া সে যদি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম পালন করিতে যায় উহা তাহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা বুঝিতে হইবে। আবার সন্ন্যাসীও যোগ ত্যাগ করিয়া ভোগ গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু অত্যাশ্রমী হইয়া সে যদি গৃহীর ধর্ম্ম পালন করিতে যায় উহা তাহার পক্ষে তেমনই অনধিকার চর্চ্চা বুঝিতে হইবে। এই অনধিকার চর্চ্চার ফলে ভারতবাসী উদ্যমহীন হইয়াছে, দেশও ডুবিয়াছে।

ইহার জন্য হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র দায়ী নহে। দায়ী—জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্র,—যাহার মোহে পড়িয়া আমরা সস্তার কিস্তিতে মোক্ষ-লাভ করিতে যাইয়া অনেক দিন হইতে 'তালগোল' পাকাইয়া 'ন গৃহি-বনস্থো' হইয়া আছি। আজ ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতে আসিয়া বুঝিলাম, যে উপায়-হীনতায় জৈন ও বৌদ্ধগণ ভারতকে পতিত করিয়াছে, সেই উপায়হীন উপায়গুলি দৃঢ়তার সহিত বর্জ্জন করিতে না পারিলে অধিকার-বাদ স্থাপিত হইবে না। অধিকার বাদ স্থাপিত না হইলে হিন্দুর লুপ্ত বীর্য্যও ফিরিয়া আসিবে না। এই যে গৃহী সংসারে থাকিয়া না ভোগী না যোগী, সন্ন্যাসী সংসার ছাড়িয়া না যোগী না ভোগী ইহার অর্থ নিজের আশ্রম ধর্ম্মে সকলেই প্রায় সমান অজ্ঞ—সুতরাং সম অশ্রদ্ধ। তাহারই ফলে ভারতের সকল অঙ্গে তথাকথিত 'সমন্বয়ের' নামে যথেচ্ছাচার প্রকাশ পাইতেছে।

আজ যে গৃহিগণ মহোৎসাহে ধন উপার্জ্জন ও জল-পিণ্ডাদির জন্য প্রজোৎপাদন দোষাবহ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে ইহার মূলে বৌদ্ধ প্রভাবই লক্ষিত হইবে। ঋষিগণ বলেন, অজ্ঞ অশ্রদ্ধের জন্যই মানব ধর্ম্মশাস্ত্র। অতএব আমরাও মানব ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অনুশীলন করিব। নিম্নে মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্রের তালিকা দেওয়া গেল,—

মন্বত্রি বিষ্ণুহারিত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্ভ সংবর্ত্তা কাত্যায়ন বৃহস্পতিঃ।

পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিতা দক্ষ গৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজকাঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য—সংহিতা ১ম, অধ্যায় ৪।৫॥

অর্থাৎ মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ভ, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ (এই বিংশতি জন মহর্ষিই) ধর্ম্মশাস্ত্র-বক্তা।

এই ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতাগণের মধ্যে মনুই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমরা মনুসংহিতার আলোচনাই প্রথমে আরম্ভ করিলাম।

১। মনুসংহিতা

মনুসংহিতা নামে যে ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু অনেকেই হয় ত উহা পাঠ করেন নাই বলিয়া জানেন না মনুসংহিতায় একা মনুই বক্তা নহেন। সংহিতায় 'মনু' আছেন, 'মহর্ষিগণ করিতেছেন' 'অগস্ত করিয়াছেন, 'মুনিগণের অভিমত' 'শৌনক, অত্রি' ও 'গৌতম বলেন' 'ভৃগু কহেন';—এমন অনেক মহর্ষি ও মুনিগণের অভিমত আছে যাহার অধিকাংশ বিধানই মূল সংহিতা অর্থাৎ বেদ-বিরোধী। সংহিতায় 'মনুর অভিমত' ও 'মনু কহেন' ভণিতায় এমন কতকগুলি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যাইবে যাহা পড়িলে আপনা হইতে প্রশ্ন উঠিবে,—এ কোন্ মনু? ইহা ছাড়া মনুসংহিতার সূচিপত্রের সহিত অধ্যায়গুলি মিলাইয়া দেখিলে পরিষ্কার দেখা যাইবে সূচীর বিষয়ীভূত অধ্যায়ের মধ্যে

এমন কতকগুলি বাজে শ্লোক আছে যাহা ঐ অধ্যায়ে না থাকিলেই অধিকতর শোভন হইত।

মনু বলিতেছেন,—

অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥ ২য়, অধ্যায় ॥ ১৩ ॥

ইহার ভাবার্থ—ধর্ম্মজিজ্ঞাসুব্যক্তির শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—বেদ।

কিন্তু সেই বেদে যদি দুই রকম মতামত দেখা যায় তখন কি হইবে? এ প্রশ্নের উত্তরে মনু বলিতেছেন,—

শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।

উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ ॥ ২য় অধ্যায়, ১৪॥

ইহার ভাবার্থ—বেদের উভয় মতই সম্যকধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিধান দেখিয়া অনেকে হয় ত বলিবেন, যখন মনু সংহিতায় পশুবধ করিতে এবং পশুবধ না করিতে বলা হইয়াছে তখন উভয় মতই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। পাছে এই রকম কদর্থ কখনও হইতে পারে এই আশঙ্কায় ঠিক পরের শ্লোকেই মনু বলিতেছেন,—"উদয়কালে ও অনুদয় কালে সূর্য্য-নক্ষত্র-রহিত কালে হোম করিবে এই দ্বিবিধ ভাবাপন্ন সকল শ্রুতিই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া সমস্ত কালেই অগিহোত্র যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবে" ॥ ২য় অধ্যায়, ১৫॥ সুতরাং মনু বেদের প্রাধান্য সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া যে সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে গৃহী কখনও নিরামিষাশী থাকিতে পারে এমন বিধান দৃষ্ট হইল না। যখন যজ্ঞ, দেবকার্য্য, পিতৃশ্রাদ্ধ এই সকলই গৃহীর অবশ্য করণীয় বলিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রের অভিমত, তখন গৃহী

আমিষাশী কিংবা নিরামিষাশী হইবে তাহা অতঃপর পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন বেদে অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ব্যবস্থা রহিয়াছে। যজ্ঞে সমাংস পুরোডাশেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে, অতিথি আগমনে সমাংস মধুপর্কেরও বিধান আছে কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যজ্ঞ, মধুপর্ক, পুরোডাশ প্রভৃতি গৃহীর জন্য নির্দ্দিষ্ট। এই গৃহীর মধ্যে ঋষিও আছেন, জন-সাধারণও আছেন—কেহই বাদ পড়েন নাই। সুতরাং অহিংসার কথা বেদে থাকিলেও প্রচলিত গার্হস্থ্য জীবনে এমন কোন উল্লেখ-যোগ্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাতে বৈদিকযুগে যজ্ঞে পশু বধ, আমিষ আহার, মধুপর্ক 'পাপ' বলিয়া বিবেচিত হইত।

যজ্ঞে পশু-বধ যেমন সনাতন বিধি, বিশিষ্ট অতিথির আগমনে 'মধুপর্ক' দ্বারা অতিথি পূজা করাও তেমনই সনাতন বিধি। অতিথি গৃহে সমাগত হইলে,—অতিথিকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানের পর তাহার নিকট মধুপর্ক উপস্থাপিত করা হইত। একটি ছোট বাটীতে দধি ও মধু থাকিত, অতিথি স্বয়ং মন্ত্রোচ্চারণের সহিত সেই দধি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতেন। তারপর অতিথির সম্মুখে একটি গাভী আনা হইত এবং তিনি "ওঁকুরু" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া গাভীটিকে নিহত করিতে আদেশ করিতেন। অতিথির আদেশে পশু-বধ হইত বলিয়া অতিথির অপর নাম 'গোঘ্ন'। অতঃপর সেই মাংসে ভোজের আয়োজন হইত। অনেকে

আবার সময় সময় গাভীটিকে বধ না করিয়া দয়াপরবশ হইয়া ছাড়িয়া দিতেন; পাছে অধিক সময় এই ঘটনা ঘটে সেই আশঙ্কায় ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্রকার আশ্বলায়ন তীব্র ভাবে ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন "নামাংসো মধুপর্কো ভবতি ভবতি", অর্থাৎ মাংস না হইলে মধুপর্ক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পারে না, পারে না।

মধুপর্কে পশুবধ মহাভারতীয় যুগেও দৃষ্ট হইত। বৌদ্ধ যুগের সময় ও তৎপরে গো-সাধন মধুপর্কের প্রচলন যজ্ঞের সহিত বন্ধ হইয়াছিল। অনেক পুরাণে যজ্ঞে ও পধুপর্কে পশু-বধ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইবে। মনুসংহিতায় প্রকারান্তরে পশুবধ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমাদের কিন্তু এই সকল দেখিয়া মনে হইয়াছিল —প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ। কিন্তু যে দেশে কেহ কখন খঞ্জই দেখে নাই,—সে দেশবাসীকে কি করিয়া বুঝাইব, তাহার নৃত্য কেমন? এ দেশে বেদ পাঠের প্রচলন না থাকাতেই যত গলদ বধিয়াছে, যত অনুদার মতের সৃষ্টি হইয়াছে, যত রাজ্যের কুসংস্কার আসিয়া হিন্দু সমাজকে পাইয়া বসিয়াছে।

মনুসংহিতার মনু বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে উদ্ভব হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকের ধারণা। তাই আমরা দেখিতে পাই,—"এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতে শ্রুতি-বিহিত যে পশুহিংসা তাহাকে অহিংসাই বলিতে হইবে, যেহেতু বেদ ইহা বলিতেছেন, বেদ হইতে ধর্ম্মের প্রকাশ হয়॥" ৫ম অধ্যায়, ৪৪॥ মনুর যুগে বেদপন্থী কখনও ভাবিতে পারিত না যে বেদ ভ্রান্ত মত প্রচার করিতে পারেন। কিংবা বেদ কখন 'সদাচার'-বিরোধী হইতে পারেন। তাই মনু

মহারাজ প্রাণ খুলিয়া বলিতেছেন,—"বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) মধুপর্কাদি বিধি বিশেষে পশু-বিনাশ করিয়া আপনার ও পশুর উভয়েরই সদ্গতি বিধান করেন॥" ৫ম, অধ্যায়, ৪২॥

বেদের বিধান যে যুক্তি-বিরোধী হইতে পারে না, সে কথা মনু, প্রকৃতির নিয়মের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন,—"ব্রহ্মা, কি প্রাণী কি উদ্ভিদ্ এই উভয়ই জীবের 'অন্ন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব কি প্রাণী আর কি উদ্ভিদ্ প্রাণ-রক্ষার জন্য আহার করা যায়" ॥৫।২৮॥ উদাহরণ সহায়ে মনু বলিতেছেন,—

"হরিণাদি পশু তৃণ আহার করে, ব্যাঘ্রাদি হরিণাদি আহার করে, হস্ত-বিশিষ্ট মানুষ হস্তহীন প্রাণী (মৎস্য) আহার করে, সিংহ প্রভৃতি পশু হস্তী প্রভৃতি তৃণ-ভক্ষক পশুদিগকে আহার করিয়া থাকে,—ইহাই নিয়ম" ॥৫।২৯॥ ভোক্তা ভোজনের উপযোগী প্রাণী সমূহ প্রতিদিন আহার করিলে দোষভাগী হয় না, যেহেতু সৃষ্টি-কর্ত্তা ভোক্তা ও ভক্ষ্যবস্তু এ উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন॥" ৫।৩০॥ পাঠক যদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন তৃণ-ভক্ষক পশু কষ্টসহিষ্ণু বটে কিন্তু মাংসভোজী পশু তেজস্বী ও বীর্য্যবান্ হয়। সিংহই পশুরাজ, হস্তী নহে।

প্রকৃতির নিয়মে যে সকল পশু তৃণ খায় তাহার দাঁত, ও যে সকল পশু মাংস খায় তাহার কষের দাঁত ছাড়া অন্য দাঁতে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তৃণ ও মাংস এই উভয়বিধ আহারের দাঁতই মানুষে রহিয়াছে। তাই মনু বলিতে পারিয়াছেন, "ন মাংস-ভক্ষণে দোষঃ—প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং॥"

৫।৫৬॥ মানুষের প্রবৃত্তিতে আসিলে হয় ইচ্ছা প্রবল আছে বলিয়াই তাহার দাঁত উভয়বিধ।

মানুষের রক্তে মাংসে অর্থাৎ প্রবৃত্তিতে যদি আমিষাহারের ইচ্ছা না থাকিত তবে মানুষের কখনও শ্বদন্ত, বা ছেদন দন্ত (Canine teeth) থাকিত না।

বেদাদি ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ ভোগের তৃপ্তিতে বিরাগ আসিতে পারে স্বীকার করেন না, এবং সেই ভোগ 'বিধিপূর্ব্বক' গ্রহণ করিতে পারিলে বিরাগ যে শীঘ্র আসিতে পারে এ তথ্য ধর্ম্মশাস্ত্র ছাড়া জৈন ও বৌদ্ধের একান্তই অবিদিত।

তাই মনু বলিতেছেন,—"অয়নের পূর্ব্বে পশু যাগ করিবে॥ ৪।২৬॥ "পশুযাগ না করিয়া নবান্ন বা মাংস ভোজন করিবে না॥" ৪।২৭॥ দেব পিতৃ কার্য্যে এবং নিত্য মাংস ভোজনের তালিকায় "বন্য কুক্কুট (৫।১২), বন্য বরাহ (৫।১৪) মেষ, শল্যক, গোসাপ, কচ্ছপ, ও সজারু সহ উষ্ট্র ছাড়া এক পাটী দাঁত বিশিষ্ট (গোঃ ব্যঞ্জন মৃগা ভক্ষ্যাঃ) পশু মাংস ভক্ষ্য বলিয়া দৃষ্ট হইবে।" ৫ম অধ্যায়, ১৮॥ যাহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতে যাইয়া বলে—'বাঙ্গালী মছলি খাতাহ্যায়' তাহারাও জানিয়া রাখুক উহা ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত বলিয়াই বাঙ্গালী মাছ খাইয়া থাকে। মৎস্যের তালিকায়,—"বোয়াল, রাজীব এবং আঁইস-যুক্ত যাবতীয় বিশিষ্ট মৎস্য দেব-পিতৃকর্ম্মে বিহিত॥" ৫।১৬॥ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা আমরা না বলিয়া পরিলাম না—তবুও বাঙ্গালী এবং কাশ্মিরী এ ভারতে যাহা কিছু ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অর্থাৎ অন্নারম্ভ হইতে শ্রাদ্ধাদি পর্য্যন্ত কাজ কর্ম্মের মান্য দিয়া থাকে,

যাহা বিশেষ করিয়া উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষাভাষী হিন্দুগণ করে না।

ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে, প্রায় পঁচিশ কোটি লোক মৎস্য মাংস আহার করিয়া থাকে।

এই তেত্রিশ কোটির মধ্যে বাইশ কোটি হিন্দু। ইহার মধ্যে কমপক্ষে পনর কোটি হিন্দু আমিষাহার করিয়া থাকে। যাহারা আমিষ আহার করে না তাহারা জৈন হইতে পারে, বৌদ্ধও হইতে পারে কিন্তু তাহারা যে বেদ-সংহিতা পন্থী নহে এ কথা বুঝাই-বার জন্যই সংহিতার আলোচনা। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র কাহাকেও চিরদিন এক প্রকার আহার করিতে বলেন নাই। এবং যজ্ঞাদিতে যে পশুবধ তাহাকে হিংসা বলিয়াও অভিহিত করেন নাই। আমরা খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়েও "অধিকারবাদ" দেখিতে পাইব। যেমন ব্রহ্মচারীর মধুমাংস ভোজন নিষেধ আছে—তেমন গৃহীও বান-প্রস্থীর জন্য আমিষাহারের বিধান রহিয়াছে। সন্ন্যাসী ভিক্ষা দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিবে। ভিক্ষান্ন পরম পবিত্র একথা শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। এই অধিকারবাদ না মানিয়া যাহারা 'মছলি খাতা হ্যায়, বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে তাহারা শাস্ত্র সম্বন্ধে একেবারে 'বরপুত্র'—! তাই মূর্খের আস্ফালন যতটা থাকিলে প্রমাণ হইবে শাস্ত্রে তাহার জ্ঞান মোটেই নাই তাহার বেশী আস্ফালন এই শ্রেণীর লোক সর্ব্বদা করিয়া থাকে বলিয়াই আমরা আমিষ প্রকরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ঋষিগণ জানিতেন 'অহিংসা' মনের একটা উচ্চ অবস্থা। এ অবস্থা সকলের হয় না, সকলের ভাগ্যে আসেও না। সুতরাং জোর

করিয়া ঐ অবস্থা জনসাধারণের মনে জাগান সম্ভবপর নহে। মনুও জানিতেন—তাই ব্রহ্মচারী ও যতির জন্য অহিংসাবাদ রক্ষা করিয়া যে গৃহীকে লড়িতে হইবে,—সংসারকে গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার জন্য সজীব জাতির 'মৃগয়া' যাগ, যজ্ঞ, প্রভৃতির প্রচলন রাখিয়াই যেন বলিতেছেন—'গৃহী কখন অহিংস হইতে পারে না।' সুতরাং যাগযজ্ঞের দেব ও পিতৃকার্য্যে এবং দৈনন্দিন আহারে মাছ মাংসের ব্যবহার যে ধর্ম্ম-সঙ্গত তাহা বলিতে যাইয়া মনু বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞে, অবশ্য পোষ্যবর্গের জীবন রক্ষার জন্য মৃগ ও পক্ষীবধ করিতে পারে, কেন না অগস্ত্য এই প্রকার আচরণ করিয়াছিলেন" ৫।২৪॥ শুধু অগস্ত্য নহেন, "পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিরা ব্রহ্মসত্র প্রভৃতি যে সকল যজ্ঞ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা মৃগ ও পক্ষীমাংসে পুরোডাশ করিয়া হোম করিয়াছেন,॥" ৫।২৩॥ ইহা ছাড়া সাধারণ বিধিও আছে। যথা,—যজ্ঞের অঙ্গীভূত অর্চ্চিত পশুর মাংস ভক্ষণ করিবে, ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হইলে একবার মাংস ভক্ষণ করিবে শ্রাদ্ধে এবং মধুপর্কে নিযুক্ত হইয়া মাংস ভক্ষণ করিবে এবং খাদ্যাভাবে জীবন বিপন্ন হইলে মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে॥" ৫।২৭॥ তারপর "যে পশুমাংস ক্রয় করা যায়, পালিত পশুর মাংস অথবা যে মাংস কেহ দান করে তদ্দ্বারা দেব ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিবে, পরে অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করিবে,॥ ৫।৩২॥ শ্রাদ্ধের বিধানে মনু বলেন,—তিল, ধান্য, যব, কৃষ্ণমাস, কলাই, যবমূল, ইহার যে কোন বস্তু শ্রাদ্ধে প্রদত্ত হইলে পিতৃলোক একমাস তৃপ্ত থাকেন। বোয়াল ও রোহিত প্রভৃতি মৎস্যে পিতৃলোক

দুইমাস, হরিণমাংসে তিনমাস, মেষমাংসে চারিমাস, পক্ষীমাংসে পাঁচমাস, ছাগমাংসে ছয়মাস, বিচিত্র মৃগমাংসে সাতমাস, এনমৃগ-মাংসে আটমাস, রুরুমৃগমাংসে নয়মাস, বরাহ ও মহিষমাংসে দশমাস, সজারু ও কূর্ম্ম মাংসে এগার মাস, গোমাংস ও দুগ্ধের পায়স দ্বারা অর্থাৎ মাংসেন গব্যেন পয়সা পায়সেন বা—বার মাস পিতৃগণ তৃপ্তিসুখ ভোগ করেন। কিন্তু বাধ্রীণস মাংসে দ্বাদশ বৎসর তৃপ্ত থাকেন॥" ৩ অধ্যায়, ২৬৭—২৭১॥

হিন্দু সমাজকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে এমন সব ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, যথা ব্যাঘ্র-বরাহ-মৃগশিকার, যজ্ঞে পশুবধ, অস্ত্রচালনা প্রভৃতি যাহাতে হিংস্রজন্তু ও আততায়ীর হস্ত হইতে ধন, মান, প্রাণ, রক্ষা করিতে সে সক্ষম হয়। সংসার পরিত্যাগী সন্ন্যাসীর 'অহিংস' হওয়া স্বাভাবিক—কিন্তু জনসাধারণ সংসারে থাকিয়া কখন যে অহিংস হইতে পারে সে তথ্য বেদ, মনুসংহিতা, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, তন্ত্রসহ অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অবিদিত। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাবে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ইতিহাস পুরাণের মধ্যে পরবর্ত্তী যুগে এমন কতকগুলি শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহাতে বৈদিক আদর্শের মূল উৎপাটনের ব্যবস্থাই করা হইয়াছে বলিতে হইবে। সে কথা আমরা পরে উল্লেখ করিব। কিন্তু তার পূর্ব্বে সকলেই জানিয়া রাখুন" মাসিক পিতৃ শ্রাদ্ধ যাহা বিহিত আছে তাহাকে অন্বাহার্য্য শ্রাদ্ধ বলে, এ শ্রাদ্ধ কিন্তু প্রশস্ত আমিষ দ্বারা প্রযত্ন সহকারে সম্পাদন করিতে হয়। ৩য় অধ্যায় ১২৩॥ এপর্য্যন্ত মনুসংহিতায় যাহা দেখা গেল তাহার পরেও মনু বলিতেছেন,—"যে মানুষ

দেবলোক পিতৃলোককে বিধিমত মাংস দিয়া ঐ মাংস ভোজন না করে সে মরিয়া ক্রমে একুশ জন্ম পশুযোনি প্রাপ্ত হয়॥" অধ্যায় ৫,৩৫॥ গৃহীমাত্রেই পিতৃশ্রাদ্ধ, দেব কার্য্য করিতে বাধ্য, সুতরাং মাছ মাংস উৎসর্গ করিতে এবং ভোজন করিতেও সে বাধ্য। অতএব মনুর বিধানে গৃহী কখন নিরামিষাশী হইবে না। পাঠক! মনুসংহিতার এই আমিষ প্রকরণ দেখিয়াও কি আপনারা বলিতে চান, যে গৃহী মাছ মাংস খায় সে কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না?—কিংবা মাছ মাংস গৃহীর পক্ষে গ্রহণে পাপ আছে? বৈদিক যুগের ঋষিগণ আমিষাহারী ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই বৈধ আমিষ গ্রহণ কল্যাণ-জনক বলিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জৈন ও বৌদ্ধ ভাবের 'পরগাছা' শ্লোক 'মনুর নামে' মনুসংহিতায় স্থান পাইয়াছে যাহা দেখিয়া পাঠক কি মনে করিবেন জানি না। কিন্তু যে মনু এক নিঃশ্বাসে (৩ অধ্যায়ের ৩।১১৯।১২০ শ্লোক ও ৫ অধ্যায়ের ২৭।৪৪ শ্লোকে) মধুপর্কের বিধান দিয়াছেন, শ্রাদ্ধে মৎস্য মাংসের (৩ অধ্যায় ১২৩।২২৭।২৫৭।২৬৭।২৬৮।২৬৯।২৭০।২৭১।২৭২ শ্লোকে) বিধান দিয়াছেন, ৪র্থ অধ্যায় ২৬।২৭।২৮ শ্লোকে পশুযাগের ব্যবস্থা এবং মাংস ভোজনের জন্য ১৩১।২৫০ শ্লোক রচনা করিয়াছেন, আমিষাহারের পক্ষে যে মনু "যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।

যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥" ৫।৩৯॥

বলিয়াছেন। যে মনু আমিষের পক্ষে ৫ম অধ্যায়ে—১২।১৪।১৬।১৮

২২।২৩।২৭।২৮।২৯।৩০।৩২।৩৫।৩৬।৪১।৪২।৪৪ এবং ৫৬ শ্লোক লিখিয়াছেন, তিনি সেই নিশ্বাসে বলিতেছেন, "পূর্ব্বোক্ত বিধিসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পিশাচের ন্যায় মাংস ভক্ষণ না করে সে লোক-সমূহের প্রিয় হয় ও ব্যাধির দ্বারা পীড়িত হয় না (৫ অধ্যায়, ৫০) ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? তারপর পাঠক! দেখিবেন মনুর নামে জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদ সংহিতার মধ্যে নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া বলিতেছে,—যাহার অনুমতিতে পশু হনন করা যায়, যে পশুকে অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে, যে পশু বধ করে, যে মাংসের ক্রয় বিক্রয় করে, যে মাংস পাক করে, যে মাংস পরিবেশন করে এবং যে মাংসভক্ষণ করে ইহাদিগকে ঘাতক বলা যায়॥ ৫ম অধ্যায়, ৫১॥ যে দেশের বহুসংখ্যক লোক অশিক্ষিত সে দেশের পুরহিতগণ যদি উপরোক্ত শ্লোক দুটি (৫ অধ্যায়, ৫০।৫১) একটা জাতিকে দশ পুরুষ ধরিয়া শুনাইতে থাকে তাহার ফল অনুমান করিতে হইলে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে গৃহি-গণের মাছ মাংসের উপরে যে ধারণা আছে তাহাই কি যথেষ্ট নহে? শুধু আহারে নহে, যাহা প্রাণপ্রদ, যাহা বলদ, এমন সকলগুলি বিধানের বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন শ্লোকগুলি পুরোহিতের মুখে শুনিয়া শুনিয়া হিন্দু এমন এক 'সংস্কার' লাভ করিয়াছে যাহা ছাড়াইয়া তাহাকে "স্বধর্ম্মে" অনুপ্রাণিত করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে। এ জন্য গীতার ন্যায় যাহাতে বেদবিরুদ্ধ ভাবের শ্লোক-গুলি বাদ দিয়া মনু-সংহিতা প্রতি হিন্দু গৃহে নিত্য পঠিত হয় তাহার ব্যবস্থা প্রত্যেক হিন্দুরই করা কর্ত্তব্য।

এ পর্য্যন্ত মনুসংহিতায় আমিষ-প্রকরণ যতদূর আলোচিত

হইয়াছে, তাহাতে সকলেই দেখিলেন, দেব, পিতৃ-কার্য্যে আমিষ-প্রদান, মনুর মতে, অবশ্য-কর্ত্তব্য। দেব এবং পিতৃ-কার্য্য ভিন্নও যে মাংস খাইতে পারা যায় তাহা এইবার দেখুন, "দ্বিজাতি যজ্ঞের জন্য এবং অবশ্য ভরনীয়দিগের পোষণের জন্য শাস্ত্র-বিহিত পশু-পক্ষী বধ করিবে, যেহেতু মহর্ষি অগস্ত্য তাহা করিয়াছেন॥ ৫।২২॥ 'অবশ্য-ভরনীয়দিগের পোষণের জন্য' 'বিহিত মাংস' যজ্ঞাদি ছাড়া দৈনন্দিন আহারে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—যেহেতু অগস্ত্য উহা করিয়াছেন। অগস্ত্য করিয়াছেন বলিয়াই কি জানিতে হইবে উহা ভাল? ঠিক সেই অর্থে গ্রহণ করিলে উত্তর হইবে 'না'। কিন্তু যদি অর্থ হয় যেহেতু অগস্ত্য, বেদজ্ঞ মহর্ষি ছিলেন—তাহা হইলে উত্তর হইবে—যজ্ঞছাড়াও মাংস ভক্ষণ অবৈদিক অশাস্ত্রীয় নহে। সুতরাং নিত্য আহারে মাংস যে গ্রহণ করা যাইতে পারে, এখানে 'অগস্ত্য করিয়াছেন' বলায় তাহাই বুঝাইতেছে। সুতরাং ভক্ষ্য বলিয়া যে পশুর নাম উল্লেখ আছে সেখানে উষ্ট্র ভিন্ন 'একপাটি দন্ত' যুক্ত পশু ভক্ষ্য বলিয়া উক্ত আছে; যথা—পঞ্চ নখের মধ্যে সজারু, শল্যক, গোসাপ, গণ্ডার, কূর্ম্ম, শশারু এবং 'উষ্ট্র বর্জ্জিতা, একতো দতো' স্বীকার করিলে গোঃব্যঞ্জন মৃগা ভক্ষ্যাঃ আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহা ভাষ্যে আচার্য্য মেধাতিথি বলিয়াছেন।

এখন দেখুন,—কেমন করিয়া মনু-সংহিতার মধ্যে প্রথমে যজ্ঞ ছাড়া বৃথা মাংস ভক্ষণ করিবে না বলা হইয়াছে, পরে সকল অবস্থায় মাংসাহারীর নিন্দা করা হইয়াছে, এবং ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখুন মনু মহারাজকে মনুসংহিতায় অচল করিবার কেমন

ব্যবস্থা হইয়াছে ; যথা,—"যে যাহার মাংস খায় তাহাকে তাহার মাংসভোজী বলে, কিন্তু মৎস্য-ভোজীকে সর্ব্ব মাংস ভক্ষ্যক বলা যায়, অতএব মৎস্য খাইবে না ॥" ৫।১৫॥ কিন্তু ঠিক পরের শ্লোকে আছে,—"বোয়াল, রোহিত ও রাজীব নামক মৎস্য, এবং যে মৎস্যের সিংহের ন্যায় তুণ্ড ও যে মৎস্য আঁইশ-যুক্ত তাহা প্রশস্ত খাদ্য ॥" ৫।১৬॥ তারপর পঞ্চম অধ্যায়ের ২৭।২৮।২৯।৩০ শ্লোক মাংস, মৎস্য ভোজন সম্বন্ধে বিধান দিয়া বলিতেছেন,—যজ্ঞীয় মাংস ভোজন করা বৈধবিধি, অন্যথায় নিজের জন্য পশু-হত্যা করিয়া মাংস ভোজন রাক্ষসবিধি ইহা মহর্ষিগণ কহিয়াছেন ॥" ৫।৩১॥ আমিষকে সীমাবদ্ধ করিবার পক্ষে বলা যাইতেছে,—"ক্রীত অথবা মৃগয়াদি দ্বারা প্রাপ্ত কিম্বা অন্যের প্রদত্ত মাংস যজ্ঞে,—দেবতাকে এবং পিতৃলোককে অর্পণ করিয়া খাইলে পাপী হইবে না ॥' ৫।৩২॥ ইহার পরে বলা হইয়াছে,—"মাংস ভোজনের দোষ ও গুণ পরিজ্ঞাত দ্বিজাতি, প্রাণবিনাশের সম্ভাবনাদি অর্থাৎ আপৎকাল ব্যতীত অবিধিপূর্ব্বক মাংস খাইবে না। অবিধিপূর্ব্বক মাংস-ভোজী যে পশুর মাংস ভোজন করিয়াছে, পরলোকে আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ হইয়া সে সেই পশুর ভক্ষিত হয় ॥" ৫।৩৩॥ মহর্ষি অগস্ত্য ইহলোকে বিনা যজ্ঞাদিতে যে পশু ও পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন পরলোকে তিনি সেই সকল পশু ও পক্ষীদ্বারা ভক্ষিত হইয়াছিলেন কি? হইবেনও বা। তারপর, "যে ধনের লোভে পশুহিংসা করে, তাহারও তাদৃশ পাপ হয় না, যাদৃশ পাপ বৃথা মাংস-খাদকের পরলোকে হইয়া থাকে ॥" ৫।৩৪॥ ভৃগু যখন বলিতেছেন—সুতরাং এ যুক্তি অকাট্য না

হইয়া যায় না! পরের শ্লোকে আছে,—শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধে অথবা মধুপর্কে নিযুক্ত হইয়া, যে মনুষ্য মাংস ভোজন না করে, সেই ব্যক্তি একবিংশতি জন্ম পর্য্যন্ত পশুত্ব প্রাপ্ত হয়॥' ৫।৩৫॥ পরের শ্লোকে, "দ্বিজাতি মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত না হইলে কদাচ পশু-মাংস খাইবে না। সংস্কৃত মাংস খাইবে॥' ৫।৩৬॥ পরের শ্লোকটি বড়ই অদ্ভুত ও হাস্যরসাত্মক; যথা;—'মাংস-ভোজনে সাতিশয় প্রবৃত্তি হইলে ঘৃতময়, অথবা পিষ্টকময় পশু নির্ম্মাণ করিয়া খাইবে, তথাপি দেব, পিতৃকার্য্য ভিন্ন পশুহিংসাতে ইচ্ছুক হইবে না॥' ৫।৩৭॥ যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি নিমিত্ত ব্যতিরেকে পশুহিংসা করে সে পশু-শরীরে যত সংখ্যক রোম আছে, তত সংখ্যক জন্ম অকাল মৃত্যু সহ্য করে॥' ৫।৩৮॥

পাঠক! একদিকে যজ্ঞাদি ভিন্ন অন্য সময়ে যেমন মাংস-ভক্ষণে বাধা ও ঘৃণা জন্মান হইতেছে দেখিলেন তেমন অপরদিকে বেদে যুগ-বিভাগ দৃষ্ট না হইলেও সংহিতায় যুগ-বিভাগ করিয়া 'সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিতে একমাত্র দানই প্রশস্ত হয়' (১।৮৬) বলিয়া কলিতে যাগ-যজ্ঞ নিষিদ্ধ এই বুদ্ধি জাগাইয়া শেষ পুরাণ ও উপপুরাণে 'কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ' বলিয়া বেদের বিরুদ্ধে যে বিধান রচিত হইয়াছে তাহারই জন্য আজ বেদে বিধান থাকিতেও হিন্দু, দেব ও পিতৃকার্য্যে মাংস প্রদান করেন না—যদিও দৈনন্দিন আহারে তাঁহারা অনেকেই মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ভৃগু বৈদিক যজ্ঞ ও মাংসভক্ষণ একসঙ্গে বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে এই হইল,—যজ্ঞ নিষিদ্ধ হইল কিন্তু মাংস-ভোজন কোন

দিনই বন্ধ রহিল না। এই যে এত করিয়া ভৃগু বলিতেছেন,—'বৃথা মাংস ভোজন করিবে না' নিতান্ত ইচ্ছা হইলে বরং 'ঘৃতময়ী ও পিষ্টকময়ী পশুর-মূর্ত্তি গড়িয়া ভক্ষণ করিবে' ইহার হেতু—পঞ্চম অধ্যায়ের ২৮।২৯।৩০ শ্লোক যাহাতে বৃথা, অবৃথা কোন কথা না বলিয়া স্বাভাবিক নিয়মে "জীবঃ—জীবস্য জীবনম্" অর্থাৎ জীবই জীবের জীবন বলায় সকল অবস্থায় মাংস খাওয়া যায় বলা হইয়াছে—তাহাকে বাধা দিবার জন্য যজ্ঞাদিতে মাংস-ভক্ষণ ব্যবস্থা রাখিয়া বৃথা মাংস গ্রহণ পাপজনক বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য কোন হেতু আমরা কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। এবং মনুসংহিতার অন্য কোথায়ও "পলপৈত্রিকম্" পিতৃশ্রাদ্ধে মাংস-প্রদান নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইল না।—

সংহিতার মূল ও ভাষ্য বুঝিবার ক্ষমতা অনেকের না থাকিলেও শুধু বঙ্গানুবাদ পড়িলেই নিতান্ত মতলববাজ লোক ছাড়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন মনু বেদাদর্শে যে সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন—বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের দ্বারা তাহার গতিরোধ করিবার জন্য জীবন-প্রদ ব্যবস্থাগুলির 'অগ্রে ও পশ্চাতে' শ্লোক রচনা করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় উহার গতিরোধ করা হইয়াছে। আর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ পুরোহিতের স্থান অধিকার করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরিয়া সেই বিরুদ্ধ শ্লোকগুলি জনসাধারণকে শুনাইয়া আসিয়াছে। তাহারই ফলে অর্থহীন 'অহিংসা' গৃহীর মনে স্থায়ী স্থান অধিকার করিয়া যজ্ঞে দেব ও পিতৃকার্য্যে আমিষ উৎসর্গ ও ভোজন পাপজনক বিবেচিত হইয়াছে।

আমরা মনুসংহিতায় আমিষ-প্রকরণের কথা উল্লেখ করিলাম। এই বার পর পর উনিশখানা সংহিতার বিষয় পাঠকগণের গোচরে আনিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে পাঠক-গণকে জানাইয়া রাখিতে চাই,—মনু যেমন স্বীকার করিয়াছেন "প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ" অর্থাৎ শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, তেমন প্রয়োগ প্রতিজ্ঞাতে মহর্ষিগণের সিদ্ধান্ত যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহাও অবগত হউন। নতুবা অনেক সংশয় আসিয়া পাঠকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। এ আশঙ্কা যথেষ্ট আছে বলিয়াই আমরা নিম্নে প্রয়োগ প্রতিজ্ঞার শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম ; যথা—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র বিদ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥
বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতিরপধাস্যতে॥

অর্থাৎ যখন শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ (পার্থক্য) উপস্থিত হইবে তখন শ্রুতিই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার পুরাণ হইতে স্মৃতি এবং স্মৃতির মধ্যে মনু সংহিতাই প্রামাণ্য জানিবে। বেদার্থ-নির্ণয়ে মনু সংহিতাই প্রধান। সুতরাং যে পুরাণ বা সংহিতা মনু স্মৃতির বিপরীত তাহা গ্রহণ-যোগ্য নহে জানিতে হইবে। অতএব পাঠক, মনু সংহিতার ভাব স্মরণ রাখিয়া দেখিতে থাকুন অপর উনিশখানা সংহিতা আমিষ-প্রকরণের পক্ষে বা বিপক্ষে কি মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন।

২। অত্রি সংহিতা

মহর্ষি অত্রি বলেন, "বহুপুত্র কামনা করা উচিত, কেন না তাহার মধ্যে যদি কোন পুত্র গয়াধামে গমন করে কেহ বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, কেহ বা নীল বৃষ উৎসর্গ করে॥" ৫৫ শ্লোক॥ মনু সংহিতায় বৈদিক যাগ-যজ্ঞ করিবার উল্লেখ বহুবার দেখিয়াছি কিন্তু মহর্ষি অত্রি অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য পুত্র কামনা করিতে বলায় আনন্দিত হইলাম। কারণ মহর্ষির মধ্যে দুষ্ট বেদ নিন্দকের প্রভাব একেবারেই ছিল না। তাই তিনি বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ বেদোক্ত হিংসাদি (পশুযাগ) দ্বারা দুষ্ট হইবে না॥" ১৮১॥ এবং ইহাও বলিয়াছেন যে,—ভক্ষ্য কাঁচা মাংস অন্ত্যজের পাত্র হইতে বাহির হইবামাত্র শুচি হইয়া থাকে॥ ২৪৭॥ অতএব মহর্ষি অত্রি আমিষাহার স্বীকার করিয়াছেন।

৩। বিষ্ণু সংহিতা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গৃহস্থ মাত্রেই যখন দেব, পিতৃকার্য্য করিতে শাস্ত্র দ্বারা আদিষ্ট তখন আমিষাহার পাপজনক কখনই বিবেচিত হইতে পারে না। অক্ষমতা যদি মাংস আহরণের কারণ হয় সেখানে অক্ষমতাই হেতু বলিতে হইবে। 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' কখন দেব ও পিতৃকার্য্যে গৃহী আশ্রয় করিবে না। বিষ্ণু সংহিতায় আছে,—"মধুপর্কে, যজ্ঞে, পিতৃ ও দেব-কার্য্যে পশু বধ করিবে। বেদার্থতত্ত্বাভিজ্ঞ দ্বিজাতি পশুহিংসায় আপনার ও পশুর উচ্চগতি বিধান করিয়া থাকে॥" ৫১ অধ্যায়, ৬৪।৬৫॥ ইহা ছাড়া,—

মনুসংহিতা ৫।৫৬॥ বেদের বিরুদ্ধে পরাশরের ধৃষ্টতা চরমে না উঠিলে আমরা মনুমহারাজকে তাঁহার বিরুদ্ধে কখন আসরে দাঁড় করাইতাম না।

সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ অধ্যায় গুলির মধ্যে আলোচনা করিবার অনেক কিছু থাকিলেও উহার আলোচনা হইতে আমরা বিরত রহিলাম।

দ্বাদশ অধ্যায়—ইহাই হইল পরাশর সংহিতার শেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আছে,—পৃথিবী-পতি রাজা যদি ব্রহ্ম-হত্যাকারী হন, তবে তাহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইবে ॥৬৪॥

পরাশর নিজ সংহিতায় যুগ বিভাগ করিয়াছেন—এবং কলিতে পরাশর স্মৃতির প্রাধান্য বলিয়াছেন। এই যুগ বিভাগ আশ্রয় করিয়া যাগযজ্ঞ রোধ করিবার জন্য যে সকল পুরাণ ও উপপুরাণের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে উক্ত আছে,—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্।
দেবরেন সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, পিতৃশ্রাদ্ধে মাংস প্রদান, নিয়োগপ্রথা—এই পঞ্চকর্ম্ম কলিযুগে ত্যাগ করিবে। অথচ এই পঞ্চ কর্ম্মই বৈদিক—সুতরাং সনাতনধর্ম্ম। অতএব পরাশর স্মৃতি কলির জন্য হইয়াও অশ্বমেধ যজ্ঞের বিধান দিয়া বেদ-মর্য্যাদাই রক্ষা করিয়াছেন।—বাকী বিধান যে অসিদ্ধ তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই। আমরা বেদে যুগ-বিভাগ না থাকায় অশ্বমেধাদি পঞ্চকর্ম্ম সর্ব্বদা সর্ব্বযুগের জন্য সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

যেহেতু অশ্বমেধাদি ঐ পঞ্চবিধ কর্ম্মই বেদে উক্ত আছে—বেদ হইতে ধর্ম্মের প্রকাশ হয় ; বেদ—অভ্রান্ত, বেদ—সনাতন।

আমিষাহারের স্বপক্ষে পরাশর কিছু না বলিলেও কলিতে যে অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে পারে বলিয়াছেন—এজন্য আমরা তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ রহিলাম।

১৪। ব্যাস সংহিতা

এই সংহিতায় আমিষ প্রকরণ সমর্থন করা হইয়াছে। মহর্ষি ব্যাস বলেন,—"নিযুক্ত না হইয়া ব্রাহ্মণ কোনরূপে মাংস ভক্ষন করিবে না। কিন্তু যজ্ঞে বা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যদি মাংস ভক্ষণ না করে তাহা হইলে পতিত হয়। ক্ষত্রিয় মৃগয়ালব্ধ মাংসে দৈব ও পৈতৃকার্য্য করিয়া তাহা ভোজন করিবে। ৩য় অধ্যায়॥ দেখা গেল আমিষাহারের পক্ষে মহর্ষি ব্যাসও আছেন। এই ব্যাস সংহিতায় বা মহাভারতে এমন কোন উল্লেখ দেখা গেল না—যাহাতে 'পরাশর স্মৃতি' কলিযুগের জন্য মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

১৫। শঙ্খ সংহিতা

আমিষাহারের পক্ষে মহর্ষি শঙ্খও বিধান দিয়াছেন দৃষ্ট হইবে। শঙ্খ সংহিতায় ১৪ অধ্যায়ের একেবারে শেষাংশে "মধু ও মাংস দ্বারা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে" বলা হইয়াছে,—"মহাশল্ক মৎস্য, পক্ষী বিশেষের মাংস, খড়্গা মাংস শ্রাদ্ধে দিলে অনন্ত ফল হইবে ইহা ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ যম বলিয়াছেন॥" (১৩ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক)। আমরা কিন্তু যম সংহিতায়—মাংসের কোন উল্লেখ দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

১৬। লিখিত সংহিতা

এই সংহিতায় অশ্বমেধ যজ্ঞ কাম্য বলা হইয়াছে। যে ভাবে বহু পুত্র কামনা করিতে মহর্ষি অত্রি ও বৃহস্পতি বলিয়াছেন—যদি কেহ গয়াধামে যায়, অশ্বমেধ যজ্ঞ করে,—সেই ভাবে লিখিত সংহিতাও বহু পুত্র প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া বেদোক্ত বিধি পালন করিতেও আদেশ রহিয়াছে। সুতরাং ইনিও আমিষাহার স্বীকার করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

১৭। দক্ষ সংহিতা

বেদমান্য করিতে উপদেশ দৃষ্ট হইল, কিন্তু যজ্ঞে দেব ও পিতৃ-কার্য্যে আমিষের ব্যবস্থার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মন্তব্য দৃষ্ট হইল না।

১৮। গৌতম সংহিতা

এই সংহিতায় বলা হইয়াছে,—শ্রাদ্ধে "তিল, মাষ, বৃহি, যব প্রভৃতি দান করিলে পিতৃগণ এক মাস তৃপ্ত থাকেন। মৎস্য, হরিণ, রুরু, শশ, কূর্ম্ম, বরাহ, এবং মেষ মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ সংবৎসর তৃপ্ত হন। ইহা ছাড়া বাধ্রীনস মাংস, কৃষ্ণছাগ মাংস এবং গণ্ডার মাংসে মধু মিশ্রিত করিয়া দান করিলে পিতৃগণ অনন্তকাল তৃপ্ত হন॥" ১৫ অধ্যায়॥ সুতরাং মহর্ষি গৌতমও আমিষ-প্রকরণ পাতক বলিয়া মনে করেন না।

১৯। শাতাতপ সংহিতা

ইনি আমিষ আহার সমর্থন করেন। ২ অধ্যায়ের সর্ব্ব

শেষাংশে পাঠক দেখিবেন যজ্ঞে পশু বধ করিলে ব্রাহ্মণের পাতক হয় না, মৃগয়াতে পশু বধ করিলেও ক্ষত্রিয়ের পাতক হয় না।

২০। বশিষ্ঠ সংহিতা

এই বশিষ্ঠ সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—দেশধর্ম্ম-জাতিধর্ম্ম-কুলধর্ম্মান্ শ্রুত্যভাবাদব্রবীন্মনুঃ। অর্থাৎ দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্মের-শ্রুতিতে অভাব (বেদে দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্মের কোন বিধান নাই,) মনু বলিয়াছেন। সুতরাং বেদের বিরুদ্ধে মনু-প্রণীত দেশধর্ম্মের জাতিধর্ম্মের, কুলধর্ম্মের যে স্থান হইতে পারে না তাহাই জাতি-বিভাগ-রহস্যে ও বিবাহ-পদ্ধতিতে দেখান হইয়াছে। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজ! অবহিত হউন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ মনুর কথা উল্লেখ করিয়া মধুপর্কে, যজ্ঞে, পিতৃ ও দেব কার্য্যে পশু বধ স্বীকার করিয়াছেন। যথা ;—পিতৃ-কার্য্যে, দেব-কার্য্যে, অতিথি সৎকারে পশু বধ করিতে পারিবে॥ ৪ অধ্যায়॥ ইহা ভিন্ন "শ্বাবিৎ, শল্যক, শশ, কূর্ম্ম, গোসাপ এবং উষ্ট্র ভিন্ন এক পাটী দাঁত বিশিষ্ট অন্য পশু ভক্ষনীয় এবং বাজসনেয় মতে ধেনু ও বৃষ মাংস পবিত্র" বলা হইয়াছে।

তবেই দেখা যাইতেছে মোট কুড়ি খানা সংহিতার মধ্যে মাত্র পাঁচ খানা সংহিতা অমিষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন মন্তব্য না

দিয়া নীরব আছেন। অবশিষ্ট পনর খানা বৈধ আমিষ আহার স্বীকার করিয়াছেন। এই পনর খানা সংহিতার মধ্যে ছয় খানা সংহিতা মধুপর্ক (আমিষ) সমর্থন করিয়াছেন। কলিতে "অশ্বমেধম্" ইত্যাদি যদি নিষিদ্ধই হইবে তবে পাঁচখানা সংহিতায় 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' প্রার্থনা করিতেন না। বিশেষতঃ পরাশর সংহিতা যাহাকে কেহ কেহ কলিযুগের জন্য মনে করেন, তিনিও প্রায়শ্চিত্ত বিধিতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা দিতে পারিতেন না। ব্যাস সংহিতা অন্যান্য সংহিতার ন্যায় দেব ও পিতৃকার্য্যে শুধু মাংসের ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বরং মনুর ন্যায়,—"যজ্ঞে বা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যদি মাংস ভোজন না করে তাহা হইলে পতিত হয়" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই কথার পরে হিন্দুগণ ভাবিয়া দেখুন শ্রাদ্ধাদি কার্য্য তাঁহারা যে করিয়া থাকেন তাহা কি ভাবে হওয়া বিধেয়।

অতীতের জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদে অতি মাত্রায় "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" পুরুষানুক্রমে শুনিয়া শুনিয়া হিন্দুমন এমন এক বিষাক্ত অবস্থায় আসিয়াছে যে এত কথা শুনিবার পরও হয়ত কেহ কেহ "কিন্তু" বলিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। সুতরাং যে গৃহস্থকে দেব ও পিতৃকার্য্য করিতে হইবে সে গৃহস্থ ধর্ম্মশাস্ত্র মান্য করিয়া নিরামিষাশী কখন হইতে পারেন কি না তাহা অতঃপর পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। আমরা ধর্ম্মশাস্ত্র সহায়ে যাহা দেখাইবার তাহা দেখাইয়াছি।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—কুড়িখানা সংহিতায় যে আমিষ-প্রকরণের আলোচনা হইল তাহা ইতিহাস পুরাণ সমর্থন করিয়াছেন কি ? সর্ব্বোপরি বেদ আমিষ সম্বন্ধে কি বলেন তাহা দেখান হইল না কেন ? এই আশঙ্কায় আমিষ প্রসঙ্গে বেদ যা বলেন, পরে ইতিহাসে ও পুরাণে যা আছে নিয়ে তাহার আলোচনা সংক্ষেপে করা হইল ঃ—

(১) ঋগ্বেদ

ঋগ্বেদ	১ম	মণ্ডল ১৩।৩১।৬১	সূক্তে	পশুবলি ও মাংসের ব্যবহার উল্লেখ আছে।
„	২য়	„ ৭	সূক্তে	বন্ধ্যা ও গার্ভিণী গাভী এবং বৃষ আহুতি দিবার উল্লেখ আছে।
„	৫ম	„ ২৯	„	মহিষ মাংস ইন্দ্রকে দেওয়া হইয়াছে।
„	৬ষ্ঠ	„ ১৬।২৮।৩৪	„	গাভী ও বৃষমাংস যজ্ঞে প্রদান ও ভোজন।
„	১০ম	„ ২৭	„	ইন্দ্রের জন্য মেষমাংস রন্ধন।
„	„	„ ২৮	„	ইন্দ্রের জন্য স্থূলকায় বৃষ রন্ধন।

গো-মাংস ! এই একটি মাত্র শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র হিন্দু-মনে যে ঘৃণা, যে আতঙ্ক, যে জাতিনাশা ভাব, পরলোকে অনন্ত নরকের যে ভয় জাগিয়া উঠে তাহা যে কি ভাবে হিন্দু সমাজে আত্ম-প্রকাশ করিল—জানাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে 'প্রাচীন ভারতে

গোমাংস' নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা আশা করিয়াছিলাম ঐ পুস্তিকার শাস্ত্রীয় সমালোচনা হইবে। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের মুখপত্র 'হিতবাদী' ও 'বঙ্গবাসী' হইতে যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল ঐ উভয় সমালোচনা বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া দুইটি তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম,—(ক) লেখকের প্রতি সমালোচকের 'গ্রাম্য ভাষা' প্রয়োগ, (খ) একটি ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা গো-বধ অশাস্ত্রীয়। মন্ত্রটি এই ঃ—

মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানমমৃতস্য নাভিঃ।
প্রনু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগাম দিতিং বধিষ্ঠ ॥ *

ঋগ্বেদ, ৮ম মণ্ডল, ১০১ সূক্ত, ১৫ ঋক্ ॥

---

* বঙ্গানুবাদ—(১) যিনি রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যের ভগিনী, অমৃতের আবাসস্থল, হে জনগণ! সেই নির্দ্দোষ অদিতি গো-দেবীকে হিংসা করিও না। এই কথা চেতনাবিশিষ্ট জনগণকে বলিয়াছিলাম ॥১৫॥

(২) বাক্য-প্রদায়িনী, বাক্য উচ্চারণ-কারিণী, সমস্তবাক্যের সহিত উপস্থিতা, দ্যোতমানা, দেবগণের জন্য আমার পরিচয় বিশিষ্টা গো-দেবীকে অল্পবুদ্ধি মনুষ্য পরিবর্জ্জন করে ॥১৬॥

(৩) ১০ম মণ্ডল ১৬৯ সূক্ত। গাভী দেবতা। শবরঋষি। গাভীগণ আপনার শরীর দেবতাদিগের যজ্ঞের জন্য দিয়া থাকে, সোম তাহাদিগের অশেষ আকৃতি অবগত আছেন। হে ইন্দ্র! তাহাদিগকে দুগ্ধে পরিপূর্ণ

সমালোচনায় 'হিতবাদী' ও 'বঙ্গবাসী' উভয় পত্রিকা এই ঋক্‌মন্ত্রটি উদ্ধার করিয়াছিলেন। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত ঋক্‌মন্ত্রের সহিত অপর দুইটি ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি,— 'হিতবাদী' ও 'বঙ্গীবাসীর' একটি মাত্র মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া গো-মাংসের ব্যবহার আর্য্যজাতির মধ্যে ছিল না বলা শোভন হয় নাই। ঋগ্বেদ, ৮ম মণ্ডল, ১০১ সূক্ত

গো-দেবতা, ভৃগু-গোত্র, জমদগ্নি ঋষি

সুতরাং মনুসংহিতায় মনুকে অচল করিবার জন্য ভৃগু যেমন ব্যবস্থার পর ব্যবস্থা রচনা করিয়াছিলেন ঋগ্বেদের মধ্যেও সেই ভৃগুর বংশধর যজ্ঞকে অচল করিবার জন্য এই ভাক্ত (প্রক্ষিপ্ত) মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। যদি তাহা না হইবে অর্থাৎ মন্ত্র যদি ভাক্ত না হইবে তবে জমদগ্নি ঋষি যে কথা চেতনাবিশিষ্ট জনগণকে বলিয়াছিলেন তাহা মনুসংহিতা, মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণকার কেহই রক্ষা করেন নাই কেন? বেদের অনুশাসন বলিয়া যদি ঐ মন্ত্র প্রচলিত থাকিত তবে ঋগ্বেদের পরে যে

করিয়া এবং সন্তানযুক্ত করিয়া আমাদিগের জন্য গোষ্ঠে পাঠাইয়া দাও ॥৩॥

ঋগ্বেদে যে তেত্রিশটি দেবতার নাম উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে গো বা গাভী দেবতার নাম দৃষ্ট হইবে না।

তাহা ছাড়াও অধিকাংশ মন্ত্র যে ভাষাতে (বৈদিক) লিখিত, এই মন্ত্র (১০১ ও ১৬৯) সে ভাষায় লিখিত নহে। বৈদিক ভাষা সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃত নামে পরিচিত হইবার পরে এই সূক্তদ্বয় লিখিত।

সকল ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল কিংবা বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ, গোপথ ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ কিংবা ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদীয় গৃহ্য সূত্র একবাক্যে গো আহুতি দিবার ব্যবস্থা সকলেই দিতে পারিতেন কি? বৃহদারণ্যকোপনিষদে কুলপাবন পুত্র-কামনায় (৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ) যে ব্যবস্থা রহিয়াছে যাহার ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন,—বিগীত শব্দের অর্থ নানাভাবে গীত অথবা প্রশংসিত অর্থাৎ বিখ্যাত। সমিতিঙ্গম অর্থ যিনি সাধারণ সভাতে উপস্থিত থাকেন অর্থাৎ সাহসী ও তেজস্বী। শুশ্রূষিতাং শব্দের অর্থ শ্রুতিমধুর। ভাষিতা—বক্তা, সমস্ত বাক্যটির অর্থ যিনি অর্থযুক্ত মার্জ্জিত ভাষা বলিয়া থাকেন। মাংস-মিশ্রিত অন্নকেই মাংসোদন বলা হয়। কি প্রকারের মাংস, তাহা বলিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন:—ঔক্ষেণ, উক্ষা শব্দের অর্থ পূর্ণাবয়ব ষাঁড়। সুতরাং ঔক্ষেণ অর্থ পূর্ণাবয়ব ষাঁড়ের মাংস। ঋষভ অর্থ বৃদ্ধ ষাঁড়। আর্ষভ অর্থ বৃদ্ধ ষাঁড়ের মাংস—তাহা শোভা পাইত কি?

ইহা ছাড়া কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে বৈদিক কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলির দ্বারা প্রাচীন বৈদিকযুগের সামাজিক আচার-ব্যবহার আমাদিগের সম্মুখে সম্যক্‌ভাবে প্রকটিত হইয়া উঠে। সেই ব্রাহ্মণে আমরা দেখিতে পাই, প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানটিই গো-মেধ ব্যতীত সুসম্পন্ন হইত না; এবং কোন্ অনুষ্ঠানে কিরূপ গো-বধ করিতে হইবে তাহাও সেই পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত আছে; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আমরা দেখিতে পাই, "কাম্য ইষ্টিতে" অর্থাৎ যখন কোন

বিশেষ ফল লাভের আশায় কোন ছোট খাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত তখন "বিষ্ণুর উদ্দেশে ক্ষুদ্রকায় বৃষ (dwarf), যজ্ঞকর্ত্তা ও বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রের উদ্দেশে অবনত শৃঙ্গযুক্ত বৃষ, বায়ুর প্রতিনিধি ইন্দ্রের উদ্দেশে গর্ভধারণ-সমর্থা (পৃশ্নিশক্ত) গাভী, বিষ্ণু ও বরুণের উদ্দেশে বন্ধ্যা গাভী, পুষণের উদ্দেশে কৃষ্ণগাভী উৎসর্গ করা হইত।" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—ইহাতে ১৮০টি পালিত পশু বলি দেওয়া উচিত। অশ্ব, বৃষ, গাভী, মৃগ ও নীলগাভী সকল রকম পশুই তাহাতে বলি হইত। সুতরাং কুত্রাপি জমদগ্নি ঋষির দৃষ্ট মন্ত্র যাহা তিনি চেতনাবিশিষ্ট মানবগণকে বলিয়াছিলেন তাহা কেহ আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পাঠক দেখিবেন 'বঙ্গবাসী' কথিত 'ব্যাল' (বন্য গরু) যজ্ঞে বা পুত্র কামনায় আহারের জন্য ব্যবহারের কোন উল্লেখ নাই। বরং গৃহপালিত বৃষ, গাভীরই উল্লেখ বেদবাদী ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদসম্বন্ধে আর আলোচনা না করিয়া এখন দেখিতে হইবে মনুসংহিতায়—আমিষ সম্বন্ধে কি আছে।

পাঠক, ভুলিবেন না জমদগ্নি ঋষি 'চেতনাবিশিষ্ট জনগণকে যে বলিয়াছিলেন—নির্দ্দোষ অদিতি গো-দেবীকে হিংসা করিও না' তারপরে দেখুন মনুমহারাজ,—সংহিতায় কি ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনু সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ৩, ১১৯, ১২০, এবং ৫ম অধ্যায়ের ২৭ ও ৪১ শ্লোকে মধুপর্কের উল্লেখ রহিয়াছে। ভাষ্যকার আচার্য্য মেধাতিথি '৩।৩' শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—গবা মধুপর্কেন। ৩।১১৯ শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—গো-বধো

মধুপর্ক-বিধাবুক্তো গোঘ্নোঽতিথিরিতি পুরুষরাজ বিষয়ং দর্শয়তি। * * * মধুপর্কঞ্চ গাশ্চৈব তস্মৈ ভগবতে ভগবতে স্বয়ং। ভগবতে বাসুদেবায় বিদুরধতি তৎসাধন দধনি ভক্ত্যা মধুপর্ক শব্দঃ প্রযুক্তঃ। '৩।১২০' ভাষ্যে আছে,—গোমধুপর্কদানং বিহিতম্। '৫।২৭' ভাষ্যে আছে,—তস্য নিয়মোক্ত ধর্ম্মার্থমেব দাতুস্তস্য হি গোরুৎসর্গপক্ষে বিহিতো, নামাংসো মধুপর্ক স্যাদিতি। '৫।৪১' ভাষ্যে আছে,—মধুপর্কো ব্যাখ্যাতঃ তত্র গোবধো বিহিতঃ।

যে কথা জমদগ্নি ঋষি চেতনাবিশিষ্ট জনগণকে বলিয়াছেন সে কথা আচার্য্য মেধাতিথিও ভাষ্য-রচনায় রক্ষা করিতে পারেন নাই। এইবার মহাভারতের কথা উল্লেখ করিব।

(২) মহাভারত

মহাভারতকার তৎকালীন সমাজে যে সকল মৎস্য ও মাংসের ব্যবহার প্রচলন ছিল তাহা শ্রাদ্ধের উপকরণে প্রযুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা,—অনুশাসন অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে। তিল, ধান্য, যব, জল, মূল ও ফল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। * * * * শ্রাদ্ধে মৎস্য প্রদান করিলে পিতৃগণের দুই মাস, মেষ-মাংস প্রদান করিলে তিন মাস, শশকমাংসে চারি মাস, অজ-মাংসে পাঁচ মাস, বরাহমাংসে ছয় মাস, পক্ষীর মাংসে সাত মাস, পৃষৎ নামক মৃগের মাংসে আট মাস, রুরুমৃগের মাংসে নয় মাস, গবয়ের মাংসে দশ মাস, মহিষমাংসে একাদশ মাস এবং

গোমাংস প্রদান করিলে পিতৃলোক এক বৎসর তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।"

(শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের বঙ্গানুবাদ দেখুন)।

মধুপর্কের প্রচলন মহাভারতের যুগেও ছিল। উদ্যোগপর্ব্ব অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ে আছে,—* * * তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুরোহিতগণ বিধানানুসারে কৃষ্ণকে গো, মধুপর্ক ও উদক প্রদান করিলেন। গোবিন্দ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কুরুগণের সহিত সম্বন্ধোচিত পরিহাস ও কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। যাহা জমদগ্নি ঋষি চেতনা-বিশিষ্ট জনগণকে বলিয়াছিলেন—তাহা শ্রীকৃষ্ণত শুনিলেন না—হায়রে অদৃষ্ট!

(৩) রামায়ণ

রাজা দশরথ পুত্র-কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞে * * * পূর্ব্বোক্ত যূপকাষ্ঠে তিন শত পশু ও এক অশ্বরত্ন নিবদ্ধ ছিল॥ ৩২॥ প্রধানা মহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া তিন খড়্গ প্রহারে তাহাকে ছেদন করিলেন॥ ৩৩, রামায়ণ, চতুর্দ্দশ সর্গ॥

রামচন্দ্র বন-গমন পথে মহানদী গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া বন্য প্রদেশে গমন করিলেন॥ ১০১॥ রাম ও লক্ষণ দুইজনে ঋষ্য, পৃষত, বরাহ ও রুরু হনন করিয়া ভোজন করিয়া সায়ংকালে বাসের জন্য এক বৃক্ষতল আশ্রয় লইলেন॥ ১০২, অযোধ্যা-কাণ্ড, দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ॥

বনগমন পথে রামচন্দ্র ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত

হইলেন, তখন * * * ধর্ম্মাত্মা ভরদ্বাজ রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনিয়া তাঁহাকে মধুপর্ক (গো, দধি, উদক, অর্ঘ) দ্বারা পূজা করিলেন॥ ১৭, অযোধ্যাকাণ্ড, চতুঃপঞ্চাশৎ-সর্গ॥

ইহা ছাড়া ভক্ষ্য মাংসের তালিকায় শল্যক, শ্বাবিধ, গোসাপ ও কূর্ম্ম পঞ্চনখ-বিশিষ্ট জীব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ভক্ষ্য বলা হইয়াছে॥ ৩১, কিস্কিন্ধাকাণ্ড, সপ্তদশ সর্গ॥

(৪) বায়ুপুরাণ

শ্রাদ্ধে আমিষ বিধান ঃ—"শ্রাদ্ধে তিল, ব্রীহি, যব, মাস, জল, মূল ও ফল প্রদান করিলে পিতৃগণ একমাস তৃপ্ত থাকেন, মৎস্যে দুইমাস, হরিণ মাংসে তিনমাস, শশক মাংসে চারিমাস, পক্ষিমাংসে পাঁচমাস, বরাহ মাংসে ছয়মাস, ছাগমাংসে সাতমাস, পৃষত মাংসে আটমাস, রুরুমাংসে নয়মাস, গবয়মাংসে দশমাস, কূর্ম্মমাংসে একাদশ মাস ; গব্যদুগ্ধ মধু ঘৃত মিশ্রিত পায়স দ্বারা এক বৎসর পিতৃগণ তৃপ্ত থাকেন। বাধ্রীনস মাংসে দ্বাদশ বৎসর, খড়্গামাংসে, কৃষ্ণ ছাগমাংসে, গাধা গোসাপ মাংসে পিতৃগণ অনন্ত কাল পরিতৃপ্ত থাকেন॥" ৮৩ অধ্যায়, ২—৯॥

(৫) বিষ্ণু পুরাণ

শ্রাদ্ধে আমিষ বিধান ঃ—বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজ যে ধর্ম্মগ্রন্থকে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত মান্য করিয়া থাকেন, এবং শ্রীরামানুজও যে গ্রন্থকে প্রামাণ্য হিসাবে পুরাণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, "শ্রাদ্ধের দিনে ব্রাহ্মণ-

দিগকে হবিষ্য করাইলে পিতৃগণ একমাস পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন, মৎস্য প্রদানে দুই মাস, শশকমাংস প্রদানে তিন মাস, পক্ষিমাংস প্রদানে চারি মাস, শূকরমাংস প্রদানে পাঁচ মাস, ছাগমাংস প্রদানে ছয় মাস, এণমাংস প্রদানে সাত মাস, রুরুমৃগমাংসে আট মাস, গবয়মাংসে নয় মাস, মেষমাংসে দশ মাস, এবং গোমাংস প্রদান করিলে এগার মাস পর্য্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন; পরন্তু যদি বাধ্রীণসমাংস দেওয়া যায় তাহা হইলে পিতৃলোক চিরদিন তৃপ্ত থাকেন।" (বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ, ষোড়শ অধ্যায়, সগরের প্রতি ঔর্ব্বের উক্তি)।

(৬) মার্কণ্ডেয় পুরাণ

শ্রাদ্ধে আমিষ বিধান :—হবিষ্যান্নদ্বারা পিতৃগণ এক মাস, মৎস্য মাংস দ্বারা দুই মাস, হরিণ মাংসে তিন মাংস, শশমাংসে চারি মাস, পক্ষিমাংসে পাঁচ মাস, শূকরমাংসে ছয়মাস, বাধ্রীণস মাংসে সাত মাস, এণমৃগমাংসে আটমাস, রুরুমাংসে নয় মাস, পিতৃগণ তৃপ্ত থাকেন। ঔভ্রমাংসে পিতৃপুরুষ এগার মাস, গব্যমাংস ও দুগ্ধের পায়সে পিতৃগণ একবৎসর তৃপ্তিলাভ করেন ॥২—৬॥

"গণ্ডারের মাস, কাল শাক, মধু, দুহিতৃ-দত্ত আমিষ বা নিবা-বংশোদ্ভব অন্য যে কোন ব্যক্তি প্রদত্ত মাংস এবং গৌরীসুত ও গয়া শ্রাদ্ধ এই সকল দ্বারা পিতৃগণের অনন্তকাল তৃপ্তি হইয়া থাকে ॥" ৩২শ অধ্যায়, ৭।৮॥

(৭) ব্রহ্ম পুরাণ

শ্রাদ্ধে আমিষ বিধান :—"হবিষ্যান্ন দানে পিতৃগণের একমাস

তৃপ্তি হয়, মৎস্য দ্বারা দুইমাস, হরিণমাংসে তিন মাস, শশকমাংসে চারি মাস, পক্ষিমাংসে পাঁচ মাস, শূকরমাংসে ছয় মাস, ছাগমাংসে সাত মাস, এণমাংসে আট মাস, রুরুমাংসে নয় মাস, গবয়মাংসে দশমাস, ঔভ্রমাংসে একাদশ মাস, এবং গোদুগ্ধে ও পায়সান্নে এক বৎসর তৃপ্ত হইয়া থাকেন। বাধ্রীণস মাংস, লোহ, কালশাক, মধু ও রোহিত মৎস্যযুক্ত অন্নে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়॥" ২২০ অধ্যায় ২২—২৮॥

(৮) অগ্নি পুরাণ

শ্রাদ্ধে আমিষ বিধান ঃ—"হবিষ্যান্ন দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে একমাস, পায়সদ্বারা এক বৎসর, মৎস্য দ্বারা দুই মাস, হরিণমাংসে তিন মাস, ঔভ্রমাংসে চারি মাস, শাকুনমাংসে পাঁচ মাস, মৃগমাংসে ছয় মাস, এণমাংসে সাত মাস, রুরুমাংসে আটমাস, বরাহমাংসে নয় মাস, শশমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ দশ মাস তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন॥" ২৯—৩২, ১৬৩ অধ্যায়।

(৯) স্কন্দ পুরাণ

শ্রাদ্ধে আমিষ বিধান ঃ—* * * সাধ্যগণ—দেবতাদিগের, বিশ্বদেবগণ ঋষিদিগের, মানবগণ শ্রাদ্ধদেবের এবং ঋষিগণ ব্রহ্ম-সনাতনের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এইরূপ পরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রাদ্ধ ধর্ম্মসনাতন। ভরদ্বাজ বংশের সাতটি অধম দ্বিজ পিতৃ-শ্রাদ্ধে গাভী মাংস প্রদান ও ভক্ষণ করিয়া জাতিস্মর ও পরম যোগী হইয়াছিলেন ॥২৬—৩০॥

আবন্ত্যখণ্ডে—অবন্তী ক্ষেত্র মাহাত্ম্যে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

(১০) শ্রীমদ্ভাগবত

এই গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাত সংসার-ত্যাগে চিন্তাকুল রাজা যুধিষ্ঠিরকে মহর্ষি নারদ বলিতেছেন,—মহারাজ! তুমি আপন পিতৃব্যাদির দেহ-যাত্রা নিমিত্ত চিন্তা করিতেছ, তোমার এ ভাবনা বৃথা, পরমেশ্বর জীবমাত্রেরই বৃত্তি বিধান করিয়া রাখিয়াছেন তাহা সর্ব্বত্রই সুলভ। দেখ, হস্তবিশিষ্ট মানুষ হস্তহীন মৎস্যাদি ভোজন করে, পশুগণ তৃণ ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। অধিক কি সকল প্রাণীই আপন হইতে ক্ষুদ্র প্রাণীকে ভক্ষণ করে। অতএব জীবই জীবের জীবিকা (খাদ্য) ॥ ৪২ ॥

জীবিকা নির্ব্বাহে জীব বধ কদাচ পাপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পার না—ইহাই হইল মহর্ষি নারদের সিদ্ধান্ত।

(১১) তন্ত্রসার

এই গ্রন্থে আছে,—

"অথ মাংসাদিশোধনম্। * * ভূচরমাংসঞ্চ।
গোমেষাশ্বমহিষকগোধাজোষ্ট্রমৃগোদ্ভবং।
মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারকং॥"

অর্থাৎ গো, মেষ, অশ্ব, মহিষ, গোধা, ছাগ, উষ্ট্র ও মৃগমাংস দেবতার প্রিয় বলিয়া এই অষ্টবিধ মাংসকে মহামাংস কহে।

এ পর্য্যন্ত যত দূর দেখা গেল তাহার বেশী দেখিতে যাইয়া গ্রন্থের কলেবর অযথা বৃদ্ধি না করিলেও পাঠকগণ নিশ্চিত বুঝিবেন,—যাহা ভৃগু-গোত্র জমদগ্নি ঋষি চেতনা-বিশিষ্ট জনগণকে

বলিয়াছিলেন তাহা কেহই বড় গ্রাহ্য করেন নাই বরং শবর ঋষি যে পরিষ্কার বলিয়া গেলেন,—গাভীগণ আপনার শরীর যজ্ঞ জন্য দিয়া থাকে, অর্থাৎ গাভী যজ্ঞে আহুত হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে—সে কথাই সমর্থন-যোগ্য।

বৈদিক যজ্ঞের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেব। সম্রাট অশোকের শাসনে বৈদিক যজ্ঞ লোপ পাইয়াছিল—ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তের দ্বারা বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য বেদ-বিরোধী মত সকল খণ্ডন করিয়া বেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেও 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' লোকের মনে এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তখন যাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বেদ আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তাঁহারাই বেদে, এই সকল 'গো-দেবতা', ও মহাভারতে 'গো-মাতা,' 'বলদ-পিতা' বিধি-বদ্ধ করিয়া এবং নূতন নূতন পুরাণ ও উপপুরাণে যুগ বিভাগ করিয়া গো-মাতার মহিমা কীর্ত্তন এবং কলিতে দেব ও পিতৃ কার্য্যে মাংস নিষিদ্ধ এই রকম ব্যবস্থা বিধি-বদ্ধ করিয়া কলির মাহাত্ম্যে যজ্ঞাদি বন্ধ ও গো-মাহাত্ম্যে জাতীয় জীবনের অগ্রগমন রুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মুষ্টিমেয় মুসলমান গো-আবরণে যুদ্ধ করিয়া হিন্দুজাতির যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল তাহা যাহারা অস্বীকার করিতে চান তাহারাই বলুন সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থের মধ্যেই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের বিধান কেমন করিয়া স্থান লাভ করিল? যে বেদমন্ত্র অভ্রান্তির মানদণ্ডে দর্শন ও বিজ্ঞানমতে পরীক্ষিত হইয়া গৃহীত

হইয়াছিল সেই বেদে দর্শন, বিজ্ঞান, এবং প্রাণিতত্ত্ব বিদ্যা বিরোধী যতগুলি সূক্ত বেদের আদর্শের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান আছে তাহার মধ্যে কোন্ মত গ্রহণ-যোগ্য এবং কোন্ মতই বা বর্জ্জন-যোগ্য তাহা নির্দ্ধারণের জন্য পাঠকগণের সুবিচারের উপর নির্ভর করিলাম।

সংহিতায় আমিষপ্রকরণে দেখাইয়াছি,—গৃহী কখনই নিরামিশাষী হইতে পারে না। এখন হিন্দু সমাজ স্থির করুন, শাস্ত্রে ও মানবমনে যে সংস্কারের বোঝা চাপিয়া আছে তাহা পোষণ করিয়া দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবেন কিংবা সনাতন শাস্ত্রবিধি মান্য করিয়া অমর হইবার জন্য নূতন করিয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করিবেন ?

গীতামুখে শ্রীভগবান্ কিন্তু বলিতেছেন,—

"যঃ শাস্ত্র-বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমানন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মং কর্ত্তুমিহার্হসি॥"

গীতা, ১৬ অধ্যায়, ২৩।২৪॥

অর্থাৎ—যে শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচার সহকারে চলে সে সিদ্ধি পায় না, সুখ পায় না, পরাগতিও পায় না, ॥১৬।২৩॥

অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য শাস্ত্রকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র-বিধানোক্ত কর্ম্ম করাই বিহিত॥ ১৬।২৪॥

পরিশিষ্ট

(১)

জাতিবিভাগ-রহস্য, বিবাহ-পদ্ধতি, আমিষ-প্রকরণ প্রবন্ধত্রয় আলোচনার পরে নিরপেক্ষ পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে,—ভৃগুর ন্যায় কৃত-বিদ্য পণ্ডিত কি কারণে এই প্রকার হীন কার্য্যে ব্রতী হইলেন যাহার ফলে হিন্দুর জাতীয় জীবন একত্ব হারাইয়া বহুবর্ণে বিভক্ত হইয়া গেল? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে কখন এই পরিবর্ত্তন আসিল এবং কেনই বা গুণগত বর্ণ, বংশগত বর্ণে পরিণত হইল তাহার সম্যক আলোচনা না হইলে ভৃগুর এই অদ্ভুত মত প্রবর্ত্তনের হেতু আমরা বুঝিতে পারিব না। সুতরাং দেখিতে হইবে, গুণগত বর্ণ কোথায় শেষ হইয়া বংশগত বর্ণে পরিণত হইয়াছিল। জাতি-বিভাগ-রহস্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কুলুজী বা বংশ-পরিচয়ে দেখাইয়াছি মহাভারতীয় যুগে গুণ-গত-বর্ণ বংশ-গত-বর্ণের মধ্যেই স্থান লাভ করিয়াছিল। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পুত্র ব্রাহ্মণ, বৈশ্যের পুত্র ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের পুত্র শূদ্র—গুণ ও কর্ম্মাশ্রয়ে বর্ণত্ব লাভ করিত। এবং ইহাও দেখাইয়াছি, সে সময়ে কাহারও নামের শেষে কোন উপপদ—শর্ম্ম, বর্ম্ম, ভূতি, দাস যুক্ত থাকিত না। মহাভারত কেন, কোন উপপুরাণই কাহারও নামের শেষে যে উপপদ থাকিত তাহার সাক্ষ্য দিবেনা। এই ভাবে যে সমাজ যাগযজ্ঞ সহায়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরেও

ভারতে বিদ্যমান ছিল, সেই যাগযজ্ঞকারী সমাজের গতি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে। বুদ্ধদেব যজ্ঞের বিরুদ্ধে যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে ছিল এক জাতীয়ত্ব, এক মোক্ষ-কামনা এবং সেই মোক্ষলাভের জন্য একই রকম শিক্ষা ও দীক্ষা। এই অভিযানের ফলে বৈদিক সভ্যতা ভাঙ্গিয়া পড়িল, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ সাধনা উপেক্ষিত হইল, গুণ-গত-বর্ণ এবং বর্ণ-গত-কর্ম্ম অনাদৃত হইল। বুদ্ধদেবের প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে সম্রাট অশোকের শাসনে বৌদ্ধধর্ম্ম অতিমাত্রায় জোরের সহিত প্রচারের ফলে রাজবিধানে বৈদিক যাগযজ্ঞ ভারত হইতে লুপ্ত হইল। ভারতের অধিকাংশ নরনারী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

মোক্ষলাভেচ্ছু বৌদ্ধগণ যতদিন ত্যাগ ও তপস্যা উজ্জ্বল রাখিয়াছিল ততদিন বৌদ্ধধর্ম্মে অর্থাৎ সঙ্ঘে ও সমাজে কোন গ্লানি ছিল না। যখন ত্যাগ ও তপস্যা কমিয়া আসিল তখন ব্যাভিচার পথে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন আরম্ভ হইল।

আচার্য্য শঙ্কর রাজা সুধন্বাকে সঙ্গে লইয়া দ্বিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। আচার্য্যের বেদান্তশাস্ত্র—রাজার হাতে শাণিত অস্ত্র, এই শাস্ত্র ও শস্ত্রে মিলিত হওয়ায় বৌদ্ধ উৎসাদন সাধিত হইল। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ—জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি বেদ-বিরোধী মতসকল পরাজিত করিল। তখন আচার্য্য শঙ্কর বেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পঞ্চ দেবতার উপাসনা, বর্ণাশ্রম স্থাপন যাহা সূত্রাকারে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মহাপ্রস্থানের পরে সেই সূত্র ভাষ্যাকারে পরিণত হইয়া বংশগত বর্ণাশ্রম স্থাপন করিয়াছিল।

আমরা শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থে পরাজিত বৌদ্ধগণকে এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীকে বর্ণাশ্রমভুক্ত করা হইতেছে দেখিতে পাইব। আর তাহারই মধ্যে অনেকেই ছিলেন বংশানুক্রমে বহুশতাব্দী ধরিয়া 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' মত-বাদের একনিষ্ঠ উপাসক—অর্থাৎ বৌদ্ধ। এই 'অহিংসা' ও 'মোক্ষ' লাভের জন্য যম-নিয়মের অধীনে যাঁহারা বহুশতাব্দী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা সুধন্বার ভয়ে বৌদ্ধমত ত্যাগ করিয়া যাঁহারা আচার্য্যের কৃপায় ব্রাহ্মণ বর্ণে স্থান লাভ করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বংশধরগণ পরবর্ত্তী যুগে বংশগত ব্রাহ্মণ বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার জন্য ঋগ্বেদে পুরুষ-সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। ইহা আমাদের অনুমান নহে। যে কেহ মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের চিরপ্রভাকৃতটীকা ও আচার্য্য মেধাতিথিকৃত ভাষ্য পড়িবার পরে কুল্লুকভট্টের টীকা পড়িবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন টীকা রচনা কালে চিরপ্রভা, ঋগ্বেদে পুরুষসূক্ত না দেখিয়া খুব কৌশলে পাশ কাটাইয়াছেন। ভাষ্য-রচনাকালে বেদজ্ঞ আচার্য্য মেধাতিথি ঋগ্বেদে পুরুষসূক্ত দেখিতে না পাইয়া যে মনু ১।৩১ শ্লোকের হাস্যকর ভাষ্য লিখিয়াছিলেন—তাহা কুল্লুকভট্ট খণ্ডন করিয়াছিলেন—শ্রুতির দোহাই দিয়া। সুতরাং আচার্য্য মেধাতিথির পরে এবং কুল্লুকভট্টের পূর্ব্বে পুরুষসূক্ত যে ঋগ্বেদে স্থান পাইয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তেমনই নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে রাজা সুধন্বার ভয়ে শিক্ষিত বৌদ্ধগণ বেদপন্থী ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহারা সংস্কারবশতঃ বৌদ্ধবাদকেই রকমফের করিয়া বৈদিক মতবাদ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। যজ্ঞে যাহাতে কথন পশুবধ না

হইতে পারে তদভিপ্রায়ে ঐ ঋগ্বেদে গো-দেবতা-সূক্ত রচনা করা হইল। যাহা পরে সকল ধর্ম্মগ্রন্থে ভাষ্যাকারে স্থান লাভ করিয়া বেদাদর্শের চিরবিরোধিতা সাধন করিয়াছিল। বৌদ্ধ সংস্কার আচার্য্য শঙ্করের নব প্রতিষ্ঠিত বেদপন্থী সমাজে প্রবল ছিল বলিয়াই বেদ, সূত্র, শাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ—এক কথায় বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল তাহার প্রত্যেক খানা গ্রন্থের মধ্যে বেদ-বিরোধী ব্যবস্থা সকল বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

যাঁহারা এ কাজ করিয়াছিলেন তাঁহারা ভৃগু, শৌনক, অত্রি নামক কল্পিত মহর্ষিগণকে দাঁড় করাইয়া যখন এই ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ ও সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন তখন আমা-দেরও যাহা বক্তব্য তাহা ভৃগু শৌনকাদিকে যেখানে যিনি বড় বক্তা সেখানে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতে হইবে। এইজন্য সংহিতা আলোচনায় প্রশ্ন হইয়াছে,—কেন ভৃগু এমন কাজ করিলেন? মনুসংহিতায় ভৃগুই যে বড় বক্তা! এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে প্রথমে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে,—(১) এইরূপ কার্য্য যাহা গর্হিত জাতি-দ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নহে তাহার অনুষ্ঠানে ভৃগুর কি স্বার্থ থাকিতে পারে? (২) তারপর দেখিতে হইবে,—জাতি তথা দেশের এই প্রকার সর্ব্বনাশ সাধনের পর লাভবান্ হইল কে?

ইহারা উত্তরে বোধ হয় বুদ্ধিমান্ পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে ভৃগুর ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত হইবার পরে অর্থাৎ গুণগত বর্ণের লোপ এবং বংশগত বর্ণের স্থাপন হইবার

পরে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের উপরে ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রভুত্ব চিরকালের নিমিত্ত অপ্রতিহত রহিবার প্রবর্ত্তন হইল।

যে বংশগত ব্রাহ্মণবর্ণের মুখপাত্র হইয়া ভৃগু এই অদ্ভুত মত প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন সেই ব্রাহ্মণ সমাজের তৎকালীন কার্য্যা-কার্য্য লক্ষ্য করিয়া ভৃগুর ন্যায় বিচক্ষণের নিকট ইহা অবিদিত ছিলনা যে,—যে ত্যাগ ও তপস্যার বলে মহাভারতীয় যুগে ব্রাহ্মণ জগৎপূজ্য ছিলেন সেই ত্যাগ ও তপস্যা দিন দিন যে পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে উত্তরকালে ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন বর্ণ যে থাকিতে পারিবে না, থাকিলেও উহা যে কেবল মাত্র নামেই পর্য্যব্যসিত হইবে সুতরাং বংশগত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচার ও শাস্ত্রগ্রন্থ অধিকারে না রাখিতে পারিলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে রক্ষা পাইতে পারে না এই আশঙ্কায় কূটবুদ্ধি ভৃগু সময় থাকিতে বংশগত ব্রাহ্মণ-বর্ণের রক্ষার জন্য শাস্ত্রগ্রন্থ অধিকার করিয়া বসিলেন। স্বার্থ এমনই অন্ধ!

ভাবী বংশের দুলালগণের স্বার্থ রক্ষা করিতে যাইয়া সমগ্র জাতির অনিষ্ট-সাধনে ভৃগু পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি অম্লান বদনে মনুসংহিতায় বিধান রচনা করিলেন,—'ব্রাহ্মণ জন্মিবামাত্র দেবতাদিগেরও পূজ্য হন, তাঁহার কথা সকল লোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের উপদেশ বেদমূলক জানিতে হইবে॥' ১১।৮৫॥ ব্রাহ্মণ অবিদ্বান্ অথবা বিদ্বান্ সকলের পরম দেবতা স্বরূপ হন, যেমন সংস্কৃত বা অসংস্কৃত অগ্নি মহাদেবতা স্বরূপ॥ ৯।৩১৭॥ মহাতেজা অগ্নি শ্মশানে শবদাহে অপবিত্র হন না বরং ঐ অগ্নি যজ্ঞকার্য্যে হূয়মান হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন (৯।৩১৮)

সেইরূপ ব্রাহ্মণেরা যদি নিন্দিত কার্য্য করেন তথাপি ব্রাহ্মণ সকলের পূজ্য যেহেতু ব্রাহ্মণ পরম দেবতাস্বরূপ ॥ ৯।৩১৯ ॥ ইহাই হইল ভৃগুর ব্যবস্থা। মনুসংহিতায় মনুমহারাজ কিন্তু বলেন,—(ক) যিনি বেদপারগ তিনি পূজনীয় হন ॥ ৩।১৩৭ ॥ (খ) যাঁহারা চারিবেদ ও ছয় বেদাঙ্গে সমধিক ব্যুৎপন্ন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে ॥ ৩।১৪৮ ॥ আদর্শ ব্রাহ্মণ চরিত্র সনাতন ধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

আদর্শ-বিচ্যুত জাতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম,—অত্যাচারীতে পরিণত হওয়া। ভৃগু ইহাও উত্তমরূপে জানিতেন। সেই নিমিত্ত ভাবী ব্যভিচারী কুলতিলকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভৃগু পূর্ব্ব হইতে বিধান রচনা করিলেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শূদ্রাপুত্র কিংবা অনূঢ়া-শূদ্রাপুত্রের ধনভাগ হয় না ॥ ৯।১৫৫ ॥

অনূঢ়া শূদ্রা কন্যাতে পুত্র উৎপাদন করিবার অধিকার ব্রাহ্মণের ছিল এবং ঐ পুত্রকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকারও ব্রাহ্মণেরই রহিল। কিন্তু এই মনুসংহিতায় শূদ্রা-পুত্রকে বিষয় দিবার ব্যবস্থাও দৃষ্ট হইবে ॥ ৯ম অধ্যায়, ১৫২,১৫৩ ॥

ব্রাহ্মণের যথেচ্ছাচার ভৃগুর বিধানে দোষাবহ নহে, কিন্তু শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ-কন্যা গমনে কি ব্যবস্থা ছিল তাহাও পাঠক জানিয়া রাখুন,—শূদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা গমন করিলে রাজবিধানে তাহার উপস্থ ছেদন হইবে ॥ ৮।৩৭৪ ॥ শুধু কি ইহাই—শূদ্র করচরণাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে প্রহার করিলে রাজা শূদ্রের সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন—ইহা 'মনুর আজ্ঞা' ॥ ৮ম অধ্যায়, ২৭৯ শ্লোক॥

মনুসংহিতার মধ্যে বিশেষ করিয়া 'মনুর আজ্ঞা' বলিলে তাহার যে কি অর্থ তাহা পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তার-পর,—শূদ্র শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে মারিবার জন্য হাত তুলিলে সে হাত কাটা যাইবে। পা তুলিলে সে পা কাটা যাইবে॥ ৮।২৮০॥ শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে রাজা তাহার কটিদেশে লৌহতপ্ত শলাকা অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন, অথবা মৃত্যু না হয় সেই ভাবে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন॥ ৮।২৮১॥ এইভাবে অষ্টম অধ্যায়ের ২৭০।২৭১ ২৭২।২৭৭।২৮২।২৮৩ শ্লোকে শূদ্রের উপর যে ভীষণ শাসনের বিধান রহিয়াছে বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

একদিকে বংশধরদিগকে যথেচ্ছাচারী হইবার সুবিধা প্রদান, অপরদিকে প্রতিকারকামীদলের 'অষ্টেপৃষ্ঠে' বন্ধন মোহগ্রস্ত ভৃগুর পক্ষে কতদূর সম্ভবপর হইয়াছিল এক্ষণে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম,—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হননের জন্য দণ্ডাদি নিপাতিত না করিয়া কেবল উদ্যত করিলেই তাহাকে তামিস্র নরকে একশত বৎসর পরিভ্রমণ করিতে হইবে॥ ৪।১৬৫॥ ক্রোধপরবশ হইয়া জানিয়া শুনিয়া 'তৃণ' দ্বারা যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তাড়না করে সেই পাপে সে কুক্কুরাদি নীচ যোনিতে একশতবার জন্ম-গ্রহণ করে॥ ৪।১৬৬॥ অস্ত্রাঘাতে ব্রাহ্মণের অঙ্গ হইতে নির্গত রক্তদ্বারা যতগুলি ধূলি একত্র হয়, অস্ত্রঘাতক ততসংখ্যক বৎসর পরলোকে শৃগাল কুক্কুরাদি দ্বারা ভক্ষিত হয়॥ ৪।১৬৮॥ অতএব বিপদগ্রস্ত হইলেও কখনও ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড উত্তোলন,

ব্রাহ্মণকে তৃণদ্বারাও তাড়না করিবে না, অথবা তাহার গাত্র হইতে শোণিতস্রাব করাইবে না ॥ ৪।১৬৯ ॥

ভৃগু ইহকালে রাজদণ্ড, পরকালে নরকভোগ এই ব্যবস্থা দ্বারা শূদ্রজাতির প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে বিরল।

এত করিবার পরও ভৃগু দেখিলেন যাহা তিনি সংহিতায় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সমগ্র ব্রাহ্মণেতর জাতিকে সম্মোহিত করিবার জন্য তাহা প্রচার করিতে না পারিলে সমস্ত বিধান-রচনাই পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে। সুতরাং এই সম্মোহন বা প্রচারকার্য্য কোনপথে সাধিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী হইতে পারে এবং ভাবী মূর্খ বংশধরগণও বিনাশ্রমে বুদ্ধি না খাটাইয়া অলস জীবন যাপন করিয়াও অর্থোপায় এবং ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে পারে তাহার জন্য ভৃগু দুই পন্থা অবলম্বন করিলেন,—(১) অশ্রদ্ধা জাগাইয়া গৃহোক্ত কর্ম্মে বিরাগ, (২) জন্ম হইতে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পুরোহিতের নিয়োগ।

ভৃগু যাগযজ্ঞ, গৃহোক্ত কর্ম্মের উপর অশ্রদ্ধা জাগাইবার জন্য ব্যবস্থা দিলেন,—যে ব্যক্তি একশত বৎসর ব্যাপিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি অবৈধ মাংস ভক্ষণ না করে এই উভয়েরই স্বর্গাদি পুণ্যফল সমান জানিবে ॥ ৫।৫৩ ॥ চমৎকার তুলনা —অদ্ভুত হেতুবাদ! তারপর—ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে একান্ত আসক্তি হওয়াতেই জীবেরা কেবল দৃষ্ট অদৃষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই অতএব ইন্দ্রিয়দিগকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই মনুষ্য অনায়াসে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ২।৯৩ ॥

যে মনু গুণগত-বর্ণ এবং কর্ম্মগত-আশ্রমবিভাগ করিয়া অবিকারবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই মনুসংহিতায় উপরোক্ত বৌদ্ধ বিধানটি যাহা অধিকারবাদ অস্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে তাহা কৌতুককর নহে কি ?

তারপর—বিষয়োপভোগের দ্বারা কামনার কখনও শান্তি হয় না বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় যেমন ঘৃতদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না, প্রত্যুত আরও প্রজ্বলিত হইয়া থাকে ॥ ২।৯৪ ॥

চতুর্থ অধ্যায়ে যাগ-যজ্ঞাদির কথা রহিয়াছে তাহার গতিরোধ করিবার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভৃগু যে সকল ব্যবস্থা রচনা করিয়াছেন তাহা যতির জন্য কি গৃহীর জন্য তাহা যদি উল্লেখ করিতেন, সমাজ বাধিত হইতে পারিত। উদাহরণ স্বরূপ আরও কয়েকটি ভৃগূক্ত বিধান উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক, সমজদার হইলে ইহাতে নিশ্চিত আনন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই।

(১) কতিপয় যজ্ঞীয় শাস্ত্রবেত্তা গৃহস্থ এই পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞের বাহ্যাড়ম্বর না করিয়া স্বীয় বুদ্ধিন্দ্রিয়তেই জ্ঞানাদির সংযমন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে যথাবিষয়ে নিয়োগ করিয়া থাকেন ॥ ৪।২২ ॥

(২) কোন কোন তত্ত্ববিদ্ গৃহস্থ (এখানে মনু নাই, মহর্ষি-গণও নাই, একেবারে তত্ত্ববিদ্ গৃহী) বাক্য-প্রাণবায়ুতে যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে অক্ষয় ফল হয় জানিয়া বাক্যে প্রাণবায়ুর হোম ও প্রাণবায়ুতে বাক্যের হোম করিয়া থাকেন ॥ ৪।২৩ ॥

(৩) বেদবিদ্ অপর গৃহী ব্রাহ্মণগণ উপনিষদাদি শাস্ত্র দ্বারা

জ্ঞানই যজ্ঞানুষ্ঠানের কারণ জানিয়া একমাত্র জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বদা পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৪।২৪ ॥

সনাতনধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড—'ব্রাহ্মণ' পুস্তকের আলোচনায় ব্রাহ্মণের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সময় তাহা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসের দ্বারা বিভক্ত রহিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, গার্হস্থ্যাশ্রমে তদ্‌বিপরীত কর্ম্মে গৃহী রত আছে দৃষ্ট হইবে। এবং ইহাও দৃষ্ট হইবে যে,—গৃহী কখনও ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ, শক্তি থাকিতে পরিত্যাগ করিবে না ॥৪।২১॥ এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে,—দিবারাত্রির আদি ও অন্তে (গৃহী) অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞ করিবে, অমাবস্যাতে দর্শ, পূর্ণিমাতে পৌর্ণমাস যাগ করিবে ॥৪।২৫॥ মনুসংহিতায় গুণগত বর্ণ এবং কর্ম্মগত আশ্রম-বিভাগ-জনিত নিত্যকর্ম্মের পার্থক্যকে অধিকারবাদ কহে। সেই অধিকার-বাদ সহায়ে গৃহী কখনও যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। এই ভাবে গৃহীকে যতিধর্ম্ম শুনাইয়া মনূক্ত আশ্রম ধর্ম্মে ভৃগু অবসাদ ও অবিশ্বাস আনয়ন করিবার জন্য দেশশুদ্ধ লোককে বৌদ্ধ নিয়মে সমভাবে যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের উপদেশ করিয়াছিলেন তাহার ফলে পঞ্চমহাযজ্ঞ, পশুযাগ ও অন্যান্য যাগ-যজ্ঞাদি অনাদৃত হইয়া কালে লুপ্ত হইয়া গেল, তখন ভৃগু বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ একে ব্রহ্মার উত্তম অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, তাহাতে আবার ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় হইতে জ্যেষ্ঠ, এবং বেদশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অধিকারী বলিয়া সমুদয় জগতের মধ্যে ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণই প্রভু হন ॥১।৯৩॥ তারপর ৯৪।৯৫।৯৬।৯৭ শ্লোকে ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নানা-

ভাবে বলিয়া পরের শ্লোকে ভৃগু বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণের দেহ, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্ত্তি; ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণ মোক্ষলাভের উপযুক্ত হন ॥১।৯৮॥ তারপর ৯৯।১৯০।১০১ শ্লোকে ব্রাহ্মণের দয়াতে যাবতীয় ইতর লোক ভোজন করিতেছে সুতরাং ব্রাহ্মণ প্রভু হন বলিয়া—ভৃগু বলিতেছেন,—ফলজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ প্রযত্ন সহকারে মানব ধর্ম্মশাস্ত্র অধয়ন করিবেন এবং শিষ্যগণকে সম্যক অধ্যয়ন করাইবেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কেহ ইহা অধ্যয়ন করাইতে পারিবেন না ॥১।১০৩॥ এই একটি মাত্র বিধানের ফলে ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্ররক্ষক ও প্রচারক হইলেন।

ইহার পরের স্তর—দৈনন্দিন কার্য্যে 'পুরোহিত' কুল সৃজন করা—।

ভৃগু তাহার পূর্ব্বে কাল-স্রোতে মিলাইয়া গেলেন। যেহেতু মনুসংহিতায় পুরোহিত সহায়ে গৃহোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি বা অন্য কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হইবে না। কিন্তু যতদূর পর্য্যন্ত ভৃগু ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের জন্য বিধান রচনা করিয়া গিয়াছিলেন—তাহাতে বংশগত ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের মস্তকের উপরে অনন্ত কালের জন্য 'কায়েম' হইয়া রহিবার সুবিধা পাইলেন।

পরের স্তরে—পুরোহিত কুলের সৃজন। এই সময় হইতে বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন,—যাহা দ্বিজাতিকে পূর্ব্বে স্বয়ং সম্পাদন করিতে হইত। এই ভাবে যজন-যাজন কর্ম্ম সহায়ে যেমন বংশগত ব্রাহ্মণ প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হইয়া অলস ও বিদ্যাহীন জীবন যাপন করিয়াও অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম রহিলেন,—অপরদিকে স্বেচ্ছামত জনসাধারণকে শাস্ত্র অর্থাৎ

'দানমেকম্' কলিযুগে 'কলিতে একমাত্র দানই ধর্ম্ম হয়' শুনাইতে লাগিলেন।

ভৃগু যে সকল বিধান ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের জন্য মনুসংহিতায় বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন—পুরোহিতগণ দেশবাসীকে সেই সকল শ্লোক শুনাইতে লাগিলেন। এই ভাবে মূল বেদ ও বেদানুগামী মনুসংহিতার প্রভাব কার্য্যতঃ সমাজ হইতে লোপ পাইল—দেশ ব্রাহ্মণের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

এই জন্যই ভৃগু কলম ধারণ করিয়াছিলেন। আমরাও স্বীকার করিতে বাধ্য, জাতিকে বহুবর্ণে বিভক্ত করিতে এবং সেই বিভক্ত বর্ণের মস্তকের উপর বংশগত ব্রাহ্মণকে স্থাপিত রাখিতে তাঁহার লেখনীধারন সার্থক হইয়াছিল।

আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠক নিরপেক্ষ ভাবে ইহাও দেখিলেন যে দ্বিজাতি বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণকে বুঝাইত। সুতরাং জ্ঞানে ব্রাহ্মণ বড় হইলেও বলে যে ক্ষত্রিয় প্রবল ছিল—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহাভারতে আছে ভৃগুবংশের সঞ্চিত অর্থের লোভে ক্ষত্রিয়গণ ভৃগুবংশের অনেককে হত্যা করিয়াছিল—পরে পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় নিধন করিয়া প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। প্রথমে হত্যা ও প্রতিহত্যা দ্বারা ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের যে মনান্তর ঘটিয়াছিল তাহা নানা হেতু আশ্রয় করিয়া ভৃগুবংশের সহিত ক্ষত্রিয়ের বংশগত বিরোধে পরিণত হইয়াছিল। পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ক্ষত্রিয়ের দিক হইতে ভৃগু বংশের উৎসাদনের কথাও ভারত-প্রসিদ্ধ। এই রকম মন কষাকষির মধ্যেও ব্রাহ্মণের

অত্যাচারে ক্ষত্রিয়ই গতিরোধকারী,—ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারে ব্রাহ্মণই গতিরোধকারী ছিলেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনার পরে মনুসংহিতার একটি শ্লোক নিরপেক্ষ পাঠকগণের গোচরে আনিতে চাহি। তাহা এই,—পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, অপহ্নব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা কর্ম্ম-দোষে (?) শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১০।৪৪ ॥

যাহা মনুসংহিতায় সূত্রাকারে স্থান লাভ করিয়াছে তাহাই মহাভারতে ব্রাহ্মণেতর জাতিকে সম্মোহিত করিবার জন্য বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে! এই ১০।৪৪ শ্লোকটি যেমন সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে তত সহজভাবে মহাভারত-কার (অনুশাসন পর্ব্ব ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়) বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যথা :—* * * ব্রাহ্মণেরা পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও উরগ-গণের পূজ্য। দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পিশাচগণের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মণদিগকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হয় না। ব্রাহ্মণ দেবতাকে অ-দেবতা ও অদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন। যাহারা ব্রাহ্মণের প্রিয় তাহারা রাজা হয়েন, যাহারা অপ্রিয় তাহারা পরাভূত হইয়া থাকে। * * * ব্রাহ্মণ যে পুরুষের প্রশংসা করেন, তিনি অভ্যুদয়শালী হন, আর তাঁহারা যাহার নিন্দা করেন সে অবিলম্বে পরাজিত হয়, সন্দেহ নাই। শক, যবন, কম্বোজ, দ্রাবিড়, কলিন্দ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মাহিষক কতকগুলি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে

শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে॥ * * * ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক পরমসুখে জীবন যাপন করিতে পারে, এরূপ লোক জীবলোকে অদ্যাপি জন্মে নাই, জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই। মুষ্টিদ্বারা বায়ু গ্রহণ এবং হস্তদ্বারা চন্দ্র স্পর্শ ও পৃথিবী ধারণ করা যেরূপ দুষ্কর, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ সু-কঠিন, সন্দেহ নাই॥ এই সম্মোহন-মন্ত্র কেমন পর্দা হইতে পর্দায় উঠিতেছে তাহা সকলে যেন বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া যান।

তারপর মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়ে আছে,—* * * ব্রাহ্মণগণকে সতত পূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণগণ সকলকে সুখ, দুঃখ প্রদান করিতে পারেন। * * * ব্রাহ্মণদিগের তেজঃ-প্রভাবে ক্ষত্রিয়দিগের তেজ ও বলের উপশম হইয়া থাকে। দেখ ভৃগুবংশীয়েরা তালজঙ্ঘদিগকে (ক্ষত্রিয়), আঙ্গিরার বংশসমুৎপন্ন মহাত্মারা নীপগণকে (ক্ষত্রিয়) এবং মহর্ষি ভরদ্বাজ বৈহতব্য ও ঐল্য (ক্ষত্রিয়) দিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। * * * ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা করাই পরম পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পাপের লেশ-মাত্রও থাকে না॥

সম্মোহনের মন্ত্র এখানে আরও ভীতিপ্রদ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে,—মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়ে আছে,—* * * ব্রাহ্মণের তপোবল ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ তপস্বী, কেহ উগ্রস্বভাব, কেহ ক্ষিপ্রকারী এবং কেহ সিংহের ন্যায়, কেহ কেহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কেহ বরাহের ন্যায়, কেহ মকরাদি জলজন্তুর ন্যায় ও কেহ

কেহ সর্পের ন্যায় প্রভাবশালী। উঁহাদের (ব্রাহ্মণ) মধ্যে কেহ কেহ আশীবিষতুল্য উগ্র, কেহ কেহ বা নিতান্ত মৃদু, কেহ কেহ বা বাঙ্‌নিষ্পতি ও কেহ কেহ বা দর্শনমাত্রেই (অপরকে) বিনাশ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ নানা প্রকার স্বভাব-সম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করা কর্ত্তব্য। মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্নশির শৌণ্ডিক, দরদ, দর্ব্ব, চৌল, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি দেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে॥

এই ঐতিহাসিক সংবাদের উপরে মন্তব্য করা অনাবশ্যক। যে ব্রাহ্মণ 'দেবতাকে অদেবতা' ও 'অদেবতাকে দেবতা' বানাইতে পারিতেন, তাঁহাদের যথেচ্ছাচারে বাধা দিতে যাইয়া যে কত,—মেকল, দ্রাবিড় লাটকে,—বেলাট হইতে হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষ পাঠক, আপনারাও দেখিলেন। এখন আপনারাই বলুন ভৃগুবংশ ভারতের হিত কি অহিত কোনটা বেশী করিয়াছেন?

পরশুরাম সম্মুখ সংগ্রামে ক্ষত্রিয় উৎসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বীর্য্যবান্ মহারথী ছিলেন—যুদ্ধ ক্ষেত্র ছিল তাঁহার বল পরীক্ষার স্থল। মনুসংহিতার যে ভৃগু রহিয়াছেন তিনি নিজকে মনুপুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি যে বহু প্রাচীন নহেন তাহা আমরা তাঁহার বৌদ্ধমত বাদে অত্যাধিক প্রীতি দেখিয়া এবং গৃহীও যতির আশ্রম ধর্ম্ম পার্থক্য রক্ষা না করিয়া সমভাবে কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে ব্যবস্থা রচনা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম,—ইনি মনু-পুত্র ভৃগু নহেন।

ইনি যেই হউন, ভৃগু গোত্র ভৃগুর বংশধর নিশ্চিতই হইবেন। এবং পরশুরামের ন্যায় ইনি সম্মুখ সংগ্রামে অসি চালনা অপেক্ষায় বেদ, মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের অন্তরালে কাপুরুষের মত আত্মগোপন করিয়া যে মসিযুদ্ধ করিতে সমধিক প্রাজ্ঞ ছিলেন তাহা যে কেহ বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পড়িলেই দেখিতে পাইবেন। সুতরাং গুপ্তঘাতক যাহা করিয়া থাকে মনুসংহিতায় বেদবিরোধী বিধান রচনা করিয়া ভৃগু ব্রাহ্মণের প্রাধান্য-রক্ষণে অর্থাগমের সুব্যবস্থা করিতে, ক্ষত্রিয়ের উৎসাদনে, বৈশ্যের অর্থ বলপূর্ব্বক গ্রহণে এবং শূদ্রের শারীরিক সমস্ত বল ব্রাহ্মণের অর্থাগমের পক্ষে প্রযুক্ত করিতে এমন কোন বিধান নাই যাহা তিনি সংহিতায় বিধিবদ্ধ করিয়া যান নাই। ভাবী বংশের দুলাল প্রীতিতে ভৃগু এমনই উন্মত্ত হইয়াছিলেন॥

ভৃগুর কৃপায় বংশগত ব্রাহ্মণবর্ণ এ ভারতে যে সম্মান, যে সুখ-সুবিধা, যে প্রভুত্ব উপভোগ করিয়াছে তাহা হাজার চেষ্টায়ও রক্ষা পাইবে বলিয়া কেহ আর আশা করেন না।

শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থাগুলি শ্লথ হইয়া পড়িতেছে, অপরদিকে তথাকথিত ব্রাহ্মণেতর বর্ণের জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষার প্রভাবে বংশগত বর্ণের প্রভাব দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। তবু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজের চৈতন্য হইতেছে না—ইহা অতীব দুঃখের বিষয়।

বেদ বলিতেছেন,—'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্', আমরা দেখিতেছি কোন অবস্থাতেই হিন্দুসমাজ আত্মস্থ হইয়া জয়শ্রী বহন করিতে পারিতেছেন না। কেন পারিতেছেন না? তাহা

আমরা প্রবন্ধত্রয়ে সাধ্যমত দেখাইয়াছি। এখন হিন্দু সমাজ ভাবিয়া দেখুন,—শতশতাব্দীর কুসংস্কার পোষণ করিয়া আত্মঘাতী বিপ্লবের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইবেন, কিম্বা 'গুরুজীকী' জয় বলিয়া অভ্রান্ত বেদ আশ্রয় করিয়া সামাজিক বিপ্লব না ঘটাইয়া উন্নতির দিকে ছুটিয়া চলিবেন।

কে বলিবে—হিন্দু সমাজ কি করিবেন?

(৩) বিগত ২৯শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৩৫ সালের বঙ্গবাসী পত্রিকায় মহামহোপধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় 'হিন্দু মহাসভা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' শীর্ষক প্রবন্ধে তৃতীয় দফার আপত্তি তুলিয়া হিন্দু-সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,—কলিযুগের প্রথম অবস্থায়—বুধগণ, লোকরক্ষার্থ নিম্নলিখিত কর্ম্ম-সমূহ ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিয়া দেন,—(১) দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, (২) কমণ্ডলু ধারণ (সন্ন্যাস), (৩) দেবরের দ্বারা সন্তানোৎপাদন ইত্যাদি—এই নিষিদ্ধ সতেরটি ব্যবস্থার মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া দৃষ্ট হইল না। উপরোক্ত সতের দফার বিধান 'বুধগণ' প্রবর্ত্তিত নিষেধাত্মক ব্যবস্থা যাহা পূর্ব্বে সমাজে প্রচলিত ছিল তাহা কেহ আর অস্বীকার করিবেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং দেখিতে হইবে, (ক) নিষেধাত্মক ব্যবস্থাগুলি শাস্ত্র-সম্মত ছিল কি না, (খ) সেই শাস্ত্রবিধি খণ্ডন করিবার অধিকার 'বুধ-গণে'র আছে কি না।

এই সকল কথা মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে একটা আদর্শ স্থির করিয়া বিচার-পদ্ধতি নির্ণয় করিতে না পারিলে অনন্তকাল ধরিয়া বিচার চলিলেও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে না। এই

জন্য চিরাচরিত প্রথা অনুসারে অভ্রান্ত বেদের বিধানকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া ধার্য্য করিলাম।

'প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ' এই আদর্শ স্থির রাখিতে বোধ হয় রক্ষণ-শীলগণও আপত্তি করিবেন না। পণ্ডিত শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা 'বুধ' বা যে কেহ বলিতে পারেন তাহাতে আপত্তি করিবার কাহারও কিছু থাকিত না যদি তিনি তাহা প্রামাণ্য বলিয়া সাধারণের সমক্ষে প্রচার না করিতেন। কিন্তু তিনি যখন প্রামাণ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন তখন আমরা বলিতে বাধ্য বুধগণ-দত্ত ব্যবস্থা বেদের বিধান অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য। ঐ বুধবাক্য গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই জগতের জাতি-সঙ্ঘের মধ্যে হিন্দু সমাজ আজ হীনাদপি হীন।

তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—কলিযুগের প্রথম অবস্থায়,— 'বুধগণ লোকরক্ষার্থ নিম্নলিখিত কর্ম্মসমুহ ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিবার্ত্তিত করিয়া দেন' ইহার অর্থ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে যাহা সনাতন বিধি বলিয়া ধার্য্য ছিল তাহা কলিযুগে অসনাতন বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে কি? যুগমাহাত্ম্যের অভিব্যক্তি-সূচক শ্লোক যাহা মনুসংহিতায় আছে তন্মধ্যে 'তপঃ পরং কৃতযুগে' (মনু, ১।৮৬) শ্লোকের অর্থের সহিত ভাষ্যের যে কোন সঙ্গতি নাই ২য় দফার আলোচনায় তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সকলে যাহা দেখিয়াছেন তাহা অপেক্ষা শতসহস্রগুণে অধিক দেখিয়াছেন,— স্বাধ্যায়ী মহামহোপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন তকরত্ন মহাশয়। তিনি কি জানেন না,—মনুসংহিতার প্রতি অধ্যায়ে পরস্পর-বিরোধী কত শ্লোক রহিয়াছে? তিনি কি জানেন না,—বেদে যুগ-বিভাগ

নাই? তবুও তিনি জানিয়া শুনিয়া কলির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এবং 'বুধগণে'র বাক্য আপ্তবাক্যের ন্যায় গ্রহণ করেন কেন? 'বুধগণ'-রচিত ব্যবস্থা যে আপ্তবাক্যের ন্যায় কলিযুগে গ্রহণ করিতে হইবে তাহার পক্ষে তিনি কোন প্রমাণ উল্লেখ করিতে পারেন নাই। যেহেতু বুধগণ বলিয়াছেন অতএব বেদের বিধান বর্জ্জন করিতে হইবে—এই মৌলিক তত্ত্ব শুনাইবার জন্য যদি তিনি লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন, দুঃখের সহিত বলিতে হইবে,—সে কথা শুনিবার জন্য কেহ তাঁহার নিকট আবেদন জানায় নাই।

হিন্দু ভারত জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ-সমাজের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন,—

(১) এক জাতীয়ত্ব-স্থাপনের অনুকূলে বেদ কি বলেন?

(২) তথাকথিত বর্ণচতুষ্টয়, 'বর্ণহীন' ও 'অন্ত্যজে'র মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি?

(৩) বেদপন্থিগণের মধ্যে আহার ও যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব কি?

(৪) বিধবা-বিবাহ বেদসম্মত ও ধর্ষিতা নারী সমাজে গ্রহণ-যোগ্যা কি না?

(৫) খাদ্য ও অখাদ্য সম্বন্ধে বেদের নির্দ্দেশ কি?

(৬) অস্পৃশ্যতা দূর করিবার পক্ষে বেদে এমন কোন বিধান আছে কি না যাহাতে অস্পৃশ্যতা পরিহার করা চলে?

(৭) শুদ্ধি সহায়ে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে বেদপন্থী করিয়া হিন্দু-সমাজে গ্রহণ করা যায় কি না?

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয় বেদের বিধান সাহস করিয়া

হিন্দু-সমাজকে শুনাইতে পারিলেন না। বেদের প্রভাব যে কল্প পর্য্যন্ত স্থায়ী সে কথাও সাহস করিয়া বলিলেন না। বলিলেন বেদ-বিরোধী বিধানের কথা যাহা 'বুধ'গণ কলিকালের প্রারম্ভে লোকের হিতের জন্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ 'বুধ'গণ বাক্য যে বেদকে উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ইহার অনুকূলে তিনি বেদ বা মনুসংহিতায় কোন বিধানই উল্লেখ করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়াছিলাম হিন্দুভারত 'বুধ'গণের বিধান মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মারফতে শুনিবার জন্য মোটেই লালায়িত নহেন।

সংহিতায় মনুমহারাজ স্বীকার করিয়াছেন,—'প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ,' প্রয়োগ প্রতিজ্ঞাতে বৃহস্পতি বিধান দিয়াছেন,—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র বিদ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমানন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥
বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতম্।
মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতিরপধাস্যতে॥"

(২)

ভ্রান্তির নিরসন বা 'বুধগণ' ব্যবস্থার দোষ-দর্শন।

হিন্দুস্থানের চিন্তাধারায় এমন কতকগুলি অবৈদিক বিধান প্রচলিত আছে, যাহা জনসাধারণ শাস্ত্রাদেশ বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। তন্মধ্যে নিম্নে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। যথা :—

(১) ব্রাহ্মণ জন্মিবামাত্র দেবতারও পূজ্য হন।

(২) যুগ-ভেদে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগে চারি রকম কর্ম্মের ব্যবস্থা।

(৩) কলিযুগের প্রথম অবস্থায়—বুধগণ, লোকরক্ষার্থ নিম্ন-লিখিত কর্ম্মসমূহ ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিয়া দেন,—(১) দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, (২) কমণ্ডলু-ধারণ, (সন্ন্যাস), (৩) দেবর দ্বারা সন্তানোৎপাদন, (৪) বাগ্‌দত্তা কন্যার পাত্রান্তরে প্রদান, (৫) দ্বিজগণের অসবর্ণা-বিবাহ, (৬) ব্রাহ্মণ আততায়ী হইলে ধর্ম্মযুদ্ধে তাহার প্রাণনাশ, (৭) যথাবিধি বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ, (৮) আচার ও বেদাধ্যয়ন প্রযুক্ত অশৌচ হ্রাস, (৯) ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, (১০) পাপে সংসর্গ-দোষ, (১১) মধুপর্কে পশুবধ, (১২) দত্তক এবং ঔরস ব্যতীত পুত্র-স্বীকার, (১৩) শূদ্রের মধ্যে দাস প্রভৃতির যে অন্ন ভোজন ছিল, তাহা, (১৪) অতিদূরের তীর্থযাত্রা, (১৫) ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ভোজনার্থ শূদ্রের পাচকতা কর্ম্ম।

উপরোক্ত বিষয়গুলি যে নিতান্তই অবৈদিক সুতরাং অশাস্ত্রীয় নিম্নে তাহা দেখান হইল। যথা :—

(১) (ক) "যিনি বেদ-পারগ তিনিই পূজনীয় হন॥" মনুসংহিতা। ৩। ১৩৭॥

(খ) "যাঁহারা চারি বেদ ও ছয় বেদাঙ্গে সমধিক ব্যুৎপন্ন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণপংক্তিপাবন বলিয়া জানিবে॥" মনুসংহিতা। ৩। ১৮৪॥ সুতরাং বুঝা গেল, ব্রাহ্মণ কর্ম্ম দ্বারা উন্নত না হইতে পারিলে মানুষেরই পূজ্য হন না—দেবতা ত অনেক দূরের কথা। এই প্রকার উক্তি অসিদ্ধ সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য জানিতে হইবে।

(২) যুগ-বিভাগ-মাহাত্ম্যের প্রকাশক যে কয়েকটি শ্লোক মনু সংহিতায় আছে—তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটিই শ্রেষ্ঠ। যথা,—

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥

মনুসংহিতা ১।৮৬॥

অর্থাৎ সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ধর্ম্ম ছিল, ত্রেতায় জ্ঞানই প্রধান, দ্বাপরে যজ্ঞই প্রধান, কলিতে একমাত্র দানই প্রধান হয়। পাঠক! আপনারা মূল ও বঙ্গানুবাদ দেখিলেন—এইবার দেখুন বেদজ্ঞ ভাষ্যকার আচার্য্য মেধাতিথি এই শ্লোকের ভাষ্যে ঠিক বিপরীত বলিতেছেন,—"অয়মন্যোযুগ স্বভাব ভেদঃ কথ্যতে। তপঃ-প্রভৃতীনাং বেদে যুগভেদেন বিধানাভাবাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বাণ্যনুষ্ঠেয়ানি। অয়ং তনুবাদো যথা কথং চিদাখ্যেয়ঃ। ইতিহাসেষু হ্যেবং বর্ণ্যতে। তপঃ প্রধানং তচ্চ মহাফলম্। দীর্ঘযুষো রোগ-বর্জ্জিতাস্তপসী সমর্থা ভবন্তনেনাভিপ্রায়েনোচ্যতে। জ্ঞানমধ্যাত্ম-বিষয়ং শরীরক্লেশার্দন্তনিয়মো নাস্তি দুষ্করঃ। যাগে তু ন মহাক্লেশ ইতি দ্বাপরে যজ্ঞঃ প্রধানম্; দানে তু ন শরীরক্লেশেনান্তসংযমো ন চাতীব বিদ্বত্তোপযুজ্যতে ইতি সুসংপাদনা॥" ইহার ভাবার্থ—"অন্য অন্য যুগের স্বভাব-ভেদ কথিত হইতেছে। বেদে কিন্তু যুগ-বিভাগ নাই, সুতরাং তপ, জ্ঞান, যজ্ঞ ও দান সকলগুলিই সর্ব্বযুগে করিতে পারা যায়। যুগে-ভেদে একটি মাত্র কর্ম্ম করিতে হইবে এমন কোন মানে নাই। ইতিহাসে উহা সীমাবদ্ধ হইয়া বর্ণিত হইবার কারণ সত্যযুগে মানুষ নীরোগ ও দীর্ঘায়ু ছিল বলিয়া তপস্যা করিতে সক্ষম সুতরাং তপস্যাই সত্যযুগে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। ত্রেতায় মানুষ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়াছিল, সেই জন্য মনঃ-সংযম

দ্বারা জ্ঞানের চর্চ্চাই অনায়াস-সিদ্ধ হইল। দ্বাপরে তপস্যা ও জ্ঞান-চর্চ্চার মত সামর্থ্য লোকের না থাকায় যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ছিল। যজ্ঞকারীর যজ্ঞে মহাক্লেশের আবশ্যক হয় না। যেহেতু যজ্ঞের সমস্ত কার্য্যই অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়। সর্ব্বশেষে কলি-যুগে মানুষ ক্ষীণজিবী, শরীর ও মন দুর্ব্বল,—এ বিধায় দানই প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

দানই একমাত্র কলিযুগে ধর্ম্ম হইতে পারে না,—তাহার বিস্তারিক আলোচনা সনাতন ধর্ম্ম ২য় খণ্ডের পরিশিষ্টে দৃষ্ট হইবে।

আমরা মনু ও বৃহস্পতির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া হিন্দু ভারতকে জানাইতেছি—বেদে যুগ-বিভাগ নাই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই যুগ-বিভাগ ইতিহাস পুরাণ করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন—সে কথার আলোচনা সুবিধা হইলে অন্য সময় করা যাইবে। সুতরাং পাঠক! আপনারা জানিয়া রাখুন, বেদের জ্ঞানকাণ্ডে আছে,—

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্-জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেন নিত্যম্॥ মুণ্ডকোপনিষদ্॥

মনুসংহিতায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকিবার বিধান রহিয়াছে; যথা,—যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হন অর্থাৎ গুরুগৃহে চিরবাস প্রার্থনা করেন, তবে গুরুকুলে বাসকরতঃ একান্ত যত্নসহকারে যাবজ্জীবন গুরুর শুশ্রূষা করিবে॥২।২৪৩॥ যে দ্বিজ যাবজ্জীবন গুরুর শুশ্রূষা করেন, তিনি অবিনাশী ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন॥৩।২৪৪॥

উপরোক্ত বিধান হইতে দেখা যাইতেছে (১) চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন বেদ ও বেদানুগামী মনুসংহিতা সমর্থন করিতেছেন।

সুতরাং 'মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতিরপধাস্ততে' বলবত জানিয়া 'বুধ'বাক্য পরিত্যক্ত হইতে বাধ্য (২) শ্রুতিতে আছে,—যদহরেব বিরজেৎ তদহরের প্রব্রজেৎ। মনুসংহিতায় আছে,—বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন, পর্ব্ব-বর্জ্জনাদি ধর্ম্মানুসারে সন্তানোৎপাদন, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে চতুরাশ্রম অর্থাৎ প্রব্রজ্যায় মনোনিবেশ করিবে ॥৬।৩৬॥

এখানেও শ্রুতি এবং স্মৃতি সন্ন্যাস সমর্থন করিতেছেন। সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণ শাস্ত্রীয় জানিতে হইবে। 'বুধ'বাক্য ত্যাগ করিতে হইবে।

শূদ্রের পাচকতার অন্ন ব্রাহ্মণ খাইতে পারেন একথা মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়, ১২৩ শ্লোকে আছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের 'বুধ'বাক্যের উত্তর প্রবন্ধ-ত্রয়ের মধ্যে আংশিক ভাবে সকলেই দেখিতে পাইবেন। তিনি যুগবিভাগের অনুকূলে মনুসংহিতায় যে শ্লোক দেখিতে পাইবেন এবং সেই শ্লোকের ভাষ্যে যে যুগবিভাগ স্বীকৃত হয় নাই তাহাও দেখিতে পাইবেন। এবং ইহাও দেখিতে পাইবেন যে যজ্ঞকে অচল করিবার জন্য 'তপঃ পরং কৃতযুগে' শ্লোক আশ্রয় করিয়া উপপুরাণে যুক্ত হইয়াছিল,—

অশ্বমেধং গবালম্বং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

অর্থাৎ অশ্বমেধযজ্ঞ, গোমেধযজ্ঞ, সন্ন্যাস, শ্রাদ্ধে মাংস প্রদান, দেবরের দ্বারা (নিয়োগ প্রথায়) সুতোৎপত্তি—এই পাঁচ ব্যবস্থা কলিতে ত্যাগ করিবে। পাঠক! আপনারা কিন্তু উক্ত পাঁচ

ব্যবস্থাই বেদানুমোদিত সুতরাং সনাতন ধর্ম্ম বলিয়াই দেখিলেন। এবং আচার্য্য মেধাতিথির ভাষ্যে ইহাও জানিলেন যে, বেদে কোন রকম যুগ-বিভাগ নাই সুতরাং একদিকে এই রকম বিধান অপর দিকে যিনি নিজের সংহিতাকে কলিযুগের জন্য ঘোষণা করিয়াছিলেন সেই মহর্ষি পরাশর রাজচক্রবর্ত্তী ব্রহ্মহত্যা করিলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে বলিয়া বিধান দিয়াছেন। ইহার সঙ্গতি রক্ষা কে করিবে?

কলিযুগে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ এ কথা কোন্ সাহসে উপপুরাণে স্থানলাভ করিয়াছিল তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। যিনি বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া ভারতে বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই আচার্য্য শঙ্কর সন্ন্যাসী ছিলেন, গীতার টীকাকার শ্রীধরস্বামী সন্ন্যাসী ছিলেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক শ্রীভাষ্যের রচয়িতা আচার্য্য শ্রীরামানুজ সন্ন্যাসী ছিলেন, দ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক বেদান্তের দ্বৈতমতের ভাষ্যকার মধ্বাচার্য্য সন্ন্যাসী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (নিমাই পণ্ডিত) সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণও সন্ন্যাস গ্রহণ কয়িয়াছিলেন। কত বলিব? বৌদ্ধ বিজয় আরম্ভ হইল সন্ন্যাসীর সহায়ে। তদবধি লোকগুরুগণ সকলেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস কলিযুগে নিষিদ্ধ, গ্রহণে পাপ—একথা আচার্য্য ভাষ্যকারগণ জানিতেন না। 'বুধগণে'র কৃপায় কেবল জানিয়াছেন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজ!

আজ হিন্দু-ভারতের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজ কোথায় থাকিতেন যদি আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি যুগাবতারগণ হিন্দু সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও

পুষ্টিসাধন না করিতেন! রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজ যখন জানিয়া শুনিয়াও যুগাবতারগণের সন্ন্যাস-গ্রহণ শাস্ত্রবিগর্হিত বলিতে সাহসী হইয়াছেন তখন 'কালপূর্ণ' হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেহেতু উক্ত আছে,—'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি' অর্থাৎ মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণ তাঁহার নিকট আসিয়া যে সব কথাবার্ত্তা শুনিতেন তাহা অনেকেই নিজ নিজ 'ডাইরীতে' লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের, কয়েকজনের বিবরণী 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' শীর্ষক নিবন্ধে 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের কল্যাণকর বিবেচনায় উহাই পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। পাঁচখানি ছবি-সম্বলিত—বাঁধাই ও ছাপা সুন্দর, ৩৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ, সাধকভাব পূর্ব্বকথা ও বাল্য-জীবন এবং দিব্যভাব

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত

১ম খণ্ড (গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ) মূল্য ১৷৷৹ ; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹। ২য় খণ্ড গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ ১৷৷৹ ; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹। ৩য় খণ্ড, সাধক ভাব, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹। চতুর্থ খণ্ড পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন মূল্য ১৶৹ ; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৲। ৫ম খণ্ড দিব্যভাব ১৷৷৶৹ ; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৷৷৹।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে উদার সার্ব্বজনীন আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দপ্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদ্গুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটি বর্ত্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব ; কারণ, ইহা তাঁহাদেরই অন্যতমের দ্বারা লিখিত।